

বিরজা ।

(উপন্যাস ।)



শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্তৃক

প্রণীত ।

কলিকাতা, বাসুদেবচন্দ্রের "স্বাদুদ্রিণী" কার্যালয়ের হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা

১১৩ নং ঐন্ট্রাট অফিস প্রেসে

শ্রীকল্যাননাথ ষ্ট্রচার্জ দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৪ সন ।

বিরজা ।

—ঃ—

(উপন্যাস ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।



প্রথম সঙ্খ্যায় ।

শতাব্দি বিগত হইয়াছে,—যখন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার
রক্তময় সিংহাসনে বাদসাহ সিরাজ উর্দৌলা আধিপত্য করিতেন,
যখন সেই ঘোর নির্দয় পায়ণের অত্যাচারে বাঙ্গালা বেহার
উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটা ঘটনা বিবৃত
করিতে অগ্রসর ।

ঐশ্বকাল, তপন দেব মনের সাথে পৃথিবীকে দণ্ড করিয়া
পুন্নিম্বাকাল্পে আপন রক্তিম লোচন বিস্তার করিতেছেন, বৈশাখ
আশা মিটেনাই, আরও দণ্ড করিতে ইচ্ছা আছে । বিরজাও
যেন বিনাময় মার্জিতদেবে অদয় গত ভয়াবহ ভাব অবগত
হইয়াই কাকলিসহ সভয়ে ঠতস্তবঃ ছুটাছুটি করিতেছে ।
ব্রতী মৃৎ বাতাসে হেলিয়া গুলিয়া সঙ্কর তরুকে প্রোক্ষিত
করিতেছে, মনের আশা মিটাইয়া লইতেছে । তরুণিরে
প্রাকৃতি কুসুমরাশি যেন আপনাপন কবিক জীবনে পঙ্খিত
জানিয়া কালরও বিবানে ক্রক্ষেপ না করিয়া আপন মূন

হাসিতেছে। এমন সময়ে নন্দনপুরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী তাঁরে ধীর পাদ বিক্ষেপে একটি যুবক উপস্থিত হইলেন। যুবক, চৌকসকায়, অল্প বয়স্ক, উন্নত নাসিকা, স্মটানো জুগল, দীর্ঘচক্ষু, প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও অস্বাভাবিক পরিপাট্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ। কিন্তু কে জানে, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যও যেন কিসের অভাব ছিল, সে সুন্দর চক্ষু যুগলে সে পূর্ণ জ্যোতিঃ নাই, যৌবনের পূর্ণ ক্ষুধা নাই, বদন বিরস। পণ্ডিত বলেন, যে “লোকের দরিদ্রতা তাঁহার মুখভাবে প্রকাশ পায়।” আমরাও “এ কথাটা গীকার করি, যুবকটির মুখভাব পরীক্ষা করিলে এ বিষয় স্পষ্টই অদ্বয়কম করা যায়।

যুবকটির নাম অম্বিকাচরণ, অম্বিকাচরণের ইহ সংসারে কেহই নাই, মাতা ছিলেন তিনিও প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল মৃত্যু হইয়াছেন, অম্বিকার অবস্থা অতি মন্দ, গোপালচন্দ্র গ্রামস্থ জমিদারের নায়ক, অম্বিকা তাঁহারই অধীনে চাকুরী করেন, যাঁহা কিছু পান তদ্বারা কায় ক্রেশে দিনাতিপাত হয়। অম্বিকাচরণের বাল্যাবধি লেখাপড়ার বড় মনোযোগ, ঈশ্বরের কাছে তাঁহার সফলতাও হইয়াছিল। অম্বিকা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ দৃষ্টি ছিলেন, কিন্তু সঙ্গায় নাই, সুতরাং লেখাপড়া শিখিয়াও তাঁহার কোন ফল দর্শে নাই, অম্বিকা স্বয়ং ঈশ্বরের অধীনে চাকুরী করিয়া দিনাতিপাত করেন।

অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ সেই অন্তর্গামী স্বাক্ষর দীপ্ত ক্ষুদ্র প্রবীর্ণিত বিমল বক্ষপাত স্থিরদৃষ্টে চাখিয়া রহিলেন, পরে, নিঃশব্দভাবে উত্থিতঃ পরিচয় করিতে, লাগিলেন, এমন সময়ে তথায় একটি রমণী, আসিয়া উপস্থিত হইল, রমণীর

বহুঃকন প্রাণ চতুর্দশ বংসর—দৈনিক্তে পাম রমণীয়, বর্ণ
পূর্ণোজ্জ্বল, বন্ধের ভাব অতি সুন্দর, মনোহর নাসিকা, দিবাচক্ষু
ভাষাতে মধুব বোণের সুখময়ী লালিত্য—সুন্দরী, আমন্ত্র জমি-
দারের নায়েব গোপালচন্দ্রের হৃদিতা নাম—“বিরজা।”

রমণীটিকে দেখিয়া অধিকাচরণ বেন সহসা পূর্বাপেক্ষা
ভাষোৎফুল্ল হইলেন, রমণী ধীর পাদ বিক্ষেপে তাঁহার নিকটে
আসিলেন, উভয়ে অনেকক্ষণ—উভয়ের বদন প্রতি তাকাইয়া
রহিলেন, বিরজা বলিলেন “তুমি দিন দিন এমন মলিন
হচ্চ কেন?”

অধিকা। বিরজা! যে হুঃখী তাহার কি না সম্ভবে?
আগি যদি মগ্ন না হব, তবে কে হবে?

বিরজা নিস্তব্ধ হইল, তাহার সেই সুন্দর চক্ষু বহিয়া গুই
এক বিন্দু অশ্রু বিনির্গত হইল।

অধিকা। তুমি কীদৃচ্চ?

বিরজা অধোদমন হইল, কোন উত্তর দিল না।

অধিকা। কেন বিরজা, কেন তুমি কীদৃচ্চ?

বিরজা। তোমার অবস্থা দেখে।

অধিকা। দরিত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে কি ভোয়া?
অনর কীদে?

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে কীদৃচ্চে
লগিলেন।

“বিরজা কীদৃচ্চহ” বলিয়া অধিকাচরণ বিরজার হস্ত
ধারণ করিলেন, অধিকার প্রাণ বেন কোম স্পন্দনো প্রয়োগ
করিল, বিরজা আবার একবার অধিকার প্রতি চাছিল, তাহার

নয়ন বুগল হঠাৎ আবার প্রবলবেগে ধর ধর ধারে অশ্রু বিপ-
 লিত হইতে লাগিল। অধিকাচরণ সমস্তে বিরজার নয়ন
 বারি মুছাইয়া দিলেন। বিরজা ধীরে ধীরে আপন মস্তকটি
 অধিকাচরণের চিত্তোবেলিত বক্ষে রক্ষিত করিয়া কাঁদিতে
 লাগিল। তখন অধিকাচরণের দারিদ্র্যানিপীড়িত চিত্তে যে
 কি অপূর্ণ জ্বাৰ জ্বীড়া করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি
 নিকীক নিষ্পন্ন ও কর্তব্য বিমূঢ় হইলেন, অগৎ ভুলিলেন,
 দায়িত্বতা ভুলিলেন, অগতের বাবতীর জ্বরতা বিমূঢ়
 হইলেন, ক্ষম্যাক্ষেপে যে ঘোর ঘনঘটা এককাল বিরাজ
 করিয়াছিল, তাহা অপনিত হইল, সুবদ শাহাদীয়া পূর্ণ
 শশাঙ্ক যেন তাহার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল,
 সে শোভা অপূর্ণ, সে শোভার প্রভাবে দীন সাম্রাজ্য
 পায়,—আজি দৈবানুগ্রহে দরিদ্র অধিকাচরণ সেই
 দেবতা-বাহিত সাম্রাজ্যের অধিকারী। এখন এ কুটিল বিশ্ব
 সংসারে আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? আমরা বলি অধিকাচরণ
 ভূমি ধন্য, এখন তোমার দারিদ্র্য অনেকের স্পৃহনীয়, বাটার
 স্বপ্নের সকলতা হয়, তাহার তুল্য পৃথী এ সংসারে আর কে
 আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশার অঙ্কব।

নন্দনপুরের অমিদার মহাশয়ের নাম উমাচরণ। উমাচরণের পিতার তিনি একমাত্র পুত্র। যৌবনকালে উমাচরণের চরিত্র ভাল না থাকার তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব উদীর পৌত্র বিজয়কৃষ্ণর নামে উইল করিয়া যান। উমাচরণ নামেও ক'থো ক্ষমিদার বটেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণর। উমাচরণ অত্যন্ত দুন্দুভ অমিদার ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে প্রজাবর্গ শণ্ডিত, কথায় বলে “বীষে পকিতে এক ঘাটে জল যায়” বস্তুতঃ ইহার অমিদারিতে ভাড়াই ছিল। যদিও উমাচরণ রান সরকার হইতে রাজসন্মান সর্চক কোন উপাধি প্রাপ্ত করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে লোকে “রাজা বাহাদুর” বলিত। তিনিও মনে মনে আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেন।

অমিদার বা রাজা বাহাদুরের বাটী নন্দনপুরের এক প্রান্ত-ভাগে, বাটীটা পেকেলে ধরণের, কিন্তু বৃহৎ—সবর অন্তর প্রায় একত্রেই, চতুর্দিকে খিল চক। বাটীর মধ্যে উমাচরণ বাবুদারী, তাঁহার ভগ্নী, তিনি বিজয়কৃষ্ণ, এতৎসত্তী আশ্রয় সম্পর্কীয় আর কেহ ছিলেন না।

মহুয়া চিরদিন আপনার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা গণিয়া থাকে, অধিক কি ভৎসনীয় দগ্ন দর্শনেও সুখানুভব করে, এত অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যতিক্রম করা যখন মানব মাত্রেয়ই সম্ভাব্য নহে, তখন গোপাল চন্দ্র যে তাহার বিপর্যয় করিবেন, ইহা ঈশ বা দোর হুঁশা মাত্র। গোপাল চন্দ্রের সংস্কার

দুহিতা বিরজা অধিকাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক
 দুঃখ বা পাপের কার্য আর কি হইতে পারে ? পতিতে
 আত্মসমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সংসার বলিতেছে পতিত
 হইলে কি হইবে, বাহ্যিক অর্থ নাই সে কি মজুদা ? সে কি কখন
 প্রেমিক পদ বাচ্য হইতে পারে ?—আমাদের গোপাল চন্দ্রেরও
 সেই ধাবণা, বিরজার এই অশ্রুত অলৌকিক আত্মসমর্পণ
 তাঁহার জ্বর প্রজ্বরিত করিতেছিল, তিনি তাঁহার প্রদাহিত
 জ্বরের হইতেছিলেন ।

‘গোপালচন্দ্রের আশা বড় উচ্চ ছিল, তিনি মনে করিতেন
 সুকি বিরজার তুল্য সুন্দরী আর বিত্তীয় নাই, বস্তুতঃ গোপালের
 ধারণা নিতান্ত অলীক রহে । তাঁহার ধারণা ছিল, বিরজা
 রাজবাণী হইবার উপযুক্ত, তবে একটা রাজ্য পুঞ্জিরা মিলেনা,
 কিন্তু তথাপি গোপাল তাঁহার আশালতার মূলে অবিরত আশা-
 ব্যাপ্তিজনক করিতেন ।

মজুদা একটা স্বপ্নধারিণী আশার অন্ধ পাতকি । সন্তান
 আমাদের বিচক্ষণ নায়ক মহাশয়ের আশা যে স্বপ্নহীন তাহা
 কি করিয়া বলিব ?—কিন্তু সেটা স্মৃতি কি ? নন্দনপুত্রের
 মকপ্রতিষ্ঠা জমিদার, হাঁটকে লোকে রাজা বলিয়া জানিত,
 তাঁহার নিজের নামে একটামাত্র পুত্র, তাঁহা বোধ হয় পাঠক
 অবগত আছেন । তিনি অবিবাহিত । কিন্তু উমাচরণ যে
 তাঁহার একমাত্র পুত্রের সামান্য নায়কের কন্যার সহিত বিবাহ
 দিবেন ইহা কি সম্ভব ? কিন্তু গোপাল ভাবিত সম্পূর্ণ সম্ভব ।
 গোপাল রইচন্দ্র জম্মাইবার পূর্বে রামায়ণ প্রকটনের নামে
 যার ভবিষ্যৎ সত্যতার একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া-

ছিলেন। তিনি বিজয়ের চরিত্র বেশ জানিতেন, অর্ধ সম্পন্ন
জীবীদারের মূৰ্খ পূর্বসে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, বিজয়
যে সেইরূপ তাহা স্বীকার্য। গোপালচন্দ্র বুকিয়াছিলেন যে
বিজয় বদ্যাপি, কোন প্রকার উত্তেজনা বশবতী হইয়া
একবার বিবরণরূপে মুগ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি স্বকাৰ্য্যে
উদ্ধার করিবেন। বিবরণ কাৰ্য্য সম্পন্ন করাটবেন। তাঁহার
এ বিবাহে উমাচরণ বাবু বিরক্ত হইলেও কোন বিশেষ
ক্ষতি নাই, তিনিই তখন সর্বসময় কর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, বিজয়
সাবালক, মনে করিলেই পিতৃ হস্ত হইতে বিবরণ বাহির করিয়া
লইতে পারিবেন। সম্ভবতঃ গোপালের এই আশাই দৃঢ়রূপে তাহার
হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস
ছিল যে এ আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। এবং এই আশা-
তেই, বিজয়কে উত্তেজিত করিয়া, অনাথ, সহায় শূন্য, অশ্র-
তীন অস্বিকাচরণের সর্বনাশ করিতে কৃতবদ্ধ হইয়াছেন।

বেণা প্রায় অবসান, যুগ্মের স্তিমিত কিরণ কাঁপিয়া
কাঁপিয়া ভূমি হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ শাখা, তপা হইতে আরম্ভ ও
উর্দ্ধে, এইরূপে ক্রমশঃ আকাশে উঠিতেছে, এমন সময়ে
এইরূপ সু বা হৃদয়তা সহচরী সমভিব্যাহারে গোপালচন্দ্র
কত প্রকার কত কৌশল চিন্তা করিতে করিতে কাৰ্য্যস্থান
হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখি-
লেন, বিজয় একাকী সেই পথে সুদৃশ্য বিকসে বিচরণ
করিতেছেন। বিজয়ের বয়ঃক্রম অন্যান্য উনবিংশতি বর্ষ
দেখিতে বেশ স্পষ্টী—কিন্তু শীর্ণ, যৌবনের বদ্বয়
অপব্যয়ে সাধারণতঃ সুবকেরা বেকুণ হইয়া থাকে, ইনিও

বিরজা ।

অক্রপ হইয়াছেন। গোপাল তাঁহাকে দূর হইতে চিনিবেন, মনে মনে বলিলেন “অগ্নীধর আমাকে এমন দিন কবে দিবেন যে দিন বিজয়কে আমরা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণ জুড়াইব” গোপালের চক্ষে প্রকৃতই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—একবার পশ্চাৎ করিয়া বিজয়ের বাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুখাবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পাপে পতিত হইল, মনে মনে বলিলেন “বিরজা, তুই এই অমর্যাবতীতে বিরাজ করি, নন্দনকাননের প্রফুল্লিত পারিজাত হইবি, ঐহিক কি কম সৌভাগ্যের কথা।” তখনই আবার হতভাগ্য অধিকাংশের বিষমমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে স্থান পাইল, হৃদয়ে কে যেন অগ্নিকুণ্ড জালিয়া দিল, দন্তে দস্ত ঘর্ষিত হইল। এমন সময়ে গোপাল বিজয়ের সম্মুখবর্তী হইলেন, বলিলেন “আজ যে এ দিকে !”

বিজয় । তে মার মেয়েকে দেখতে ।

গোপালচন্দ্র মুহূর্ত্তাসিয়া বলিলেন “আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার কুটরে আশনার পদার্পণ হবে।”

উভয়ে চলিলেন, গোপাল বিজয়ের সন্নিহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ বাটিতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল তাঁহার বাটির সম্মুখে একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়কে দেখাটলেন। বিজয় তাহার পাখিপাটের বিস্তার প্রাঙ্গণ করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে বাটির সম্মুখ উপরের ঘর—যে ঘরে বিরজা বসিয়া ছিল, তদ্বাখ্য লইয়া গেলেন, তথায় একটি সুন্দর পরিচারিকা বসিয়াছিল। গোপালচন্দ্র অতি সমাদরে বিজয়কে তাহাতে উপবেশন করাইলেন ।

বিরজা ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

—::—

বিজয়চন্দ্র ।

সতী কক্ষমধ্যে বিজয়কে দেখিয়া বিরজা লজ্জাবনত মুখী চটয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল । বিরজার দাসী ভাষার অনুসরণ করিল । বসন্ত ঘোঁষনা হিরা সৌদামিনীরূপা বিরজাকে দেখিয়া বিজয়ের মন যে বিচলিত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, বিজয় বিনুনের না'র গৃহান্তর গমনপর বিরজার প্রতি এক দৃষ্টে তাক্যুটয়া বহিলেন । বিরজার অপূর্ণ সুখী একবার মাল বিজয়ের কলুষিত নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই যেন কি বৈহাতিক প্রক্রিয়াবলে তথায় তাল অঙ্কিত হইয়াগেল । গোপালচন্দ্র সকল বিষয়েই বিচক্ষণ, তিনি স্ফুৰ্ত্ত মাথোঁ বিজয়ের স্তম্ভগত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে তাহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা গণনা করিয়া পুলকিত হইলেন ।

গোপাল বিজয়কে গৃহান্তরে গমন করিতে দেখিয়া বলিলেন “ বিরজা এদিকে এস, তাকে লজ্জা কি ? ”

বিরজা আসিল না ।

বিজয় । তোমার কন্যাটী পরমা স্নেহবতী ।

গোপাল “ আজ্ঞা হাঁ ” বলিয়া আবার বিজয়কে বলিলেন “ দাঁ সা এস, এদিকে এস । ”

বিরজা তথাপি আসিল না ।

বিব্রজা। তাইত এসে বড় লজ্জা।

গোপাল। বিব্রজা! কথা শুন্‌চনা?

বিব্রজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া ঘর দেশে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইল, আবার বিব্রজা নির্ধন্য লোচনে সেই অধঃনয়ীর রূপবিভা অবলোকন করিয়া নয়নপরিভূত করিতে লাগিলেন।

বিব্রজার মূখে কথা নাই, নির্দাক, নিষ্পন্দ। গোপাল চক্ষু এমত সময়ে কোন কার্যের ভাণ করিয়া নিচেয়ে গেলেন, সেই সঙ্গে দাসী বিজলীকেও ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিব্রজাও বটবার উপক্রম করিল, কিন্তু গোপালচক্ষু রাগভরে কহিলেন “উঁনি কি একলা থাকিবেন, তুমি একটু থাক্‌কে পার না।”

বিব্রজার চক্ষু সজল হইল, দুই এক বিন্দু উফা অশ্রুবারি বীরে অলিত হইয়া মুক্তিকা স্পর্শ করিল। বিব্রজা দাঁড়াইল।

বিব্রজা গাজোখান করিয়া বিব্রজার হস্ত ধারণ করিলেন; বিব্রজার ভাষা সচ্ছ হইল না, সে সজোরে খীর হস্তাক্ষণ করিয়া সরোননে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই আকস্মিক ঘটনার বিব্রজা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না। দ্বারের পশ্চাত্তাগে গোপালচক্ষু গুপ্তভাবে ভাঁহাবের কথা বার্তা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। বিব্রজাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তিনি রোষভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন “পাজি সেয়ে ঝাঁর খেয়ে এত বড়টা হালি তাঁর কথা শুনি স্‌নে। হোর মৌভাগা যে উঁনি হোকে বিবাহ কর্তে চেয়েছেন।” বিব্রজার দিকে কিরিতা কহিলেন “বিব্রজা বলিকা, আপনি ওর কণা

কিছু মনে করিবেন না। আপনার প্রস্তাব আমার গিরোধার্য্য।”

বিজয়। তবে আমি এখন আনি?

গোপাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল “বল্লে পারেন, জলখাবার আরোজন হয়েছে, যদি—”

বিজয় পাত্ৰোৎখান করিয়া কহিলেন “না, না, আজ নয়, আর এক দিন হবে।”

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বিজয় ধীর পাদ বিক্ষেপে বিরজার অপূর্ণ রূপ মাধুরী ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। গোপাল বাটীর বহির্দুর্গে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রিয় সন্মিলন।

আবার সন্ধ্যা বাল—যে সময়ে প্রণতীর অদরে প্রেমের কুক্ষি স্পৃষ্ট হয়, যে সময়ে আশ্রিত হয়, যে সময়ে প্রেমের বিলাস-ক্ষেত্রে নন্দমগ্নিকা প্রকটিত হয়, সেই সুখের সময়ে, সেই

পূর্বস্থানে, আমাদের পূর্ব পরিচিত প্রণয়ীস্বর সন্মিলিত।
কিন্তু পাঠক! মনে করিবেন না যে উভয়ে প্রেমের লতরী
লীলায় লীন। তার দরিদ্রতা, তোমার নিকট কি প্রণয়ীর
অব্যাহতি নাই?—প্রণয়ের অনন্তস্থ ইহাও কি তোমার
অভাবে আলিঙ্গন?—

প্রণয়ীস্বর অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে অস্থির
বলিলেন “বিরজা! তুমি আমার ভাল বাসিয়া আপন স্থান
নষ্ট করিলে?”

বিরজা সোৎসুকভাবে কহিল, “কেন অস্থির?”

অস্থির। দেখ বিরজা, আমি এমন অমূল্য নিধি
স্বপ্নের সুখার্থ্য হাতে পাইয়াও সুখানুভবে অসমর্থ; এবং
দরিদ্রতা—মগ্নভেদী দরিদ্রতা, তদুপরে নৃশংস অপমানের
ভয়ঙ্কর বিবে অর্জিত। বিরজা, এ দরিদ্রের উত্তর হৃদয়কে
কি প্রেমাজ্বর প্রফুটিত হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত হইবে
পারে?

অস্থির চক্ষে জল আসিল। বিরজা অস্থির চক্ষে
জল মুচাঠিয়া দিয়া কহিলেন, “অস্থির! কাঁদিও না, তোমার
এক বিন্দু অশ্রুজল আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত তরল লৌহ চালিয়
দেয়, আমি সকল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার চক্ষে
জল দেখিতে পারি না।”

অস্থির। বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা! আমি বাস
হইয়া চন্দ্রম্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি কি মনে ক
বে তুমি আমার হৃদয়ে, ইহা কি সম্ভব? তোমার পিতা বি
আমার হস্তে তোমার নাম অমূল্য কহিছুর সমর্পণ করিবেন?

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল “প্রাণাধিক! কি আশ্রিতে কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, তুমিই আমার আশ্রয় দেবতা, আমি এ জীবনে আর কাহারও হইব না, ইহাতে আমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়।”

অধিকার চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইল, বলিলেন “বিরজা! তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, প্রণয়ের মুক্তিমতী দেবী—বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা—বিবাহের কথা হুরে থাকুক, তোমার পিতা হয়ত আমাকে নিরাপরাধে আমার কার্য্য হইতে অবস্থত করিবেন। প্রাণাধিকে, তাহা হইলে আমার দশায় কি হইবে ভাব দেখি? আমি হয়ত উদরপূর্ণ অন্নের জন্য লালসায়িত হইব, হয়ত ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইব।”

বিরজা। কেন তোমার ঢাক্রী যাবে?

অধিকা। সে অনেক কথা।

অধিকাচরণের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, প্রেমময়ী বিরজা দ্রুত বসনাকল দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল “তবে কি আমি পিতাকে তোমার নিমিত্ত বলিব?”

অধিকা। না বিরজা! একথা তুমি তাহার নিকট প্রকাশ করিও না। ইহাতে স্বকুলের পরিবারে কুল ফলিবে, এই হইবে যে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যে স্তব্ধ হইবে করিতাম, যে অনন্ত আশ্রয়ে হৃদয়কে বদ্ধ করিতাম, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা একবারে বিলুপ্ত হইবে।

উভয়ে অনেককণ নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,

কাহার মুখে কথা নাই, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছে। এমন সময়ে তথায় সহসা গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল চন্দ্রকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলে ন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। উভয়ের তালু শুক হইয়া আসিল, পাদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া কহিলেন, “বিরজা এ কি!”

বিরজা। নির্ঝাক নিস্পন্দ।

গোপাল। কোথায় তোমার রাজরাণী করিতে কৃতসংকল্প, না তুমি একটা কান্ডালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছ, তোমায় ধিক্ আর আমার জীবনেও ধিক্; আমার কন্যার যে একরূপ নীচ প্রবৃত্তি হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

কাহারও বাকক্ষুণ্টি নাই। উভয়ের চক্ষুই মুক্তিকা সংলগ্ন।

গোপাল। অশ্বিকে, তোর কি সাহস যে তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিস্—তোর আবার বিবাহের সাধ, আপনি ধোঁতে খাস্নে স্ত্রীকে খাওয়াবি কি?

অশ্বিকা। আপনি অন্যায়—”

গোপাল। রেখে দে তোর অন্যায়, তোর কথা শুন্নে আমার হাড় জলে যায়, ফের যদি কথা কবি, তা হলে জুড়িয়ে মুঠ ভেঙ্গে দেব, পাড়ি—ছুঁচো।

অশ্বিকা কাঁদিতে লাগিলেন।

গোপাল। আজ থেকে তোর চাকরি গেল, কিন্তু তুই একেবারে এ দেশ ছেড়ে যাবি, যদি না বাস, তা হলে দেখাবি, তোর কি হয়। তোর চুঃখে শেরাল কুকুর কাঁদবে!

অধিকা নিস্তরুভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন । গোপাল বিরজার হস্ত ধারণ করিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কেবল যদি কখন এমন দেখি, তা হলে ঘেরে ফেলব । চল, তোমার বেকনো বার করবো, এই বুঝি তোমার নদীতে গা ধুতে আসা ?”

গোপাল বিরজাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন ।

অধিকা যতক্ষণ বিরজাকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ অনিমেষলোচনে তাহার প্রতি চিত্তার্পিত পুস্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ বিরজা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মগ্নি ঢালিয়া দিল । তিনি আকুল নয়নে একাকী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন । তখন তাঁহার হৃদয় হইতে দারিদ্র্যের তামসীমূর্ত্তি অপসৃত হইল, বিরজা যে আর তাঁহার হইবে না, তখন ইহাই তাঁহার দুঃখ, এ দুঃখের নিকট সকল দুঃখ পরাস্ত হইল ।

অধিকাচরণ অনেকক্ষণ তদবস্থতাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, আগ্রন ললাটকে শত ধিকার দিলেন, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বিরস হৃদয়ে তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন । যেন কত হর্ষল, যেন কত বার হৃদয় পীড়ার অগম্য বাতনা লভ্য করিয়াছেন ।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

অপকারের শেষ ।

উক্ত ঘটনার পরদিবস আবার বিজয়চন্দ্র আসিলেন, কিন্তু সে দিনও বিরজা তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না, বস্তুত এ সকল তাঁহার পিতার সহ্য হইতে ছিল না । বিজয়চন্দ্র প্রস্থান করিলে, গোপাল আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই ভগ্ন-হৃদয়া একমাত্র ছুড়িতাকে অন্যায় তিরস্কার করিতে ক্রটি করিলেন না । গোপালচন্দ্র স্ত্রীলোকে সংসারের জীব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, স্ত্রীলোকের মহামত নাই, ইহাই তাঁহার ঐক্য বিশ্বাস ছিল । স্ত্রীতে কেহ অধিক অনুজ্ঞ হইলে, তাঁহাকে দৈব বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, স্ত্রী না থাকায় গোপালচন্দ্রের এই ধারণা ও সাহস বৃদ্ধি পাঠিয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু স্ত্রীলোক জগতের কেহই নহে, ইহাই তাঁহার ভীকু বুদ্ধির স্বাক্ষর !

স্ত্রীলোক বুঝে না, স্ত্রীরাঃ বিরজা বুঝিবে কি প্রকারে ? বিরজা যে আপনার সুখ দুঃখ বুঝে না, ইহা গোপালচন্দ্রের বড় দুঃখ । কোণায় রাজরাণী হইবে, তিনি রাজপুত্র হইবেন, ইহাতে তাঁহার অনিচ্ছা, অথচ আশ্রয়হীন, সহায়, সম্পত্তিশূন্য অস্বিকাচরণকে ভালবাসিতে, বিবাহ করিতে, বিনামূল্যে তাঁহার চরণে ইহ জন্মের তরে বিকাইতে প্রস্তুত । কিন্তু এ কথা কি কেহ শুনে ? যাহা পরিবর্তিত আশালতার মূলে কে এমন অন্ধ আছে যে কুঠারাঘাত করে ? যদি করে

সে সংসারী নয়,—নররূপী দেবতা ! কিন্তু ভূতে কখন মানুষ হয় ? মানুষ ভূত হইতে পারে । গোপাল আনাদের সেই কিস্তৃত কিম্বাকার ভূত, সে স্বাৰ্গাস্থ । গোপাল দেখিলেন যে আনানিশাকাকালে প্রকৃতই পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার সাধের চাবাগাছে সভাই কঁুড়ি ধরিয়াছে ! বিজয়ের মন সে ভিজিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন । কিন্তু উপায় ? হতভাগিনী বিরজা ত বিজয়কে চায় না, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস তাহার অভিপ্রেত ; রাজার পুত্র বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া পথের ভিখারি অধিকাচরণে আশ্রয় ।

গোপালচন্দ্র ভাবিলেন স্ত্রীলোকে স্বদয় দৰ্পণবৎ, বাহা সমুখে থাকে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা কমিলে তাহা আর থাকে না ! চাকুরী না থাকায় অধিকার স্বাধীন বৃত্তিটুকু পিয়াছে, বা দু দিনে ষাটবে, কিন্তু বিরজার ত তাহাতে মানসিক পরিবর্তন ঘটে নাই । এখন কর্তব্য কি ? অধিকাকে বিরজার নয়নাস্তরাল করা আবশ্যিক, তাহার উপায় কি ? সহসা অধিকাকে দেশ তহিতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক হইয়াছে । গোপাল কয়েক দিন সেই উপায় চিন্তায় গঢ়নিবৃত্ত রহিলেন । বিজয়চন্দ্রের সহিত সেই অবধি বেশ মাথামাথি হইয়াছে, গোপাল যাহা বলেন বিজয় এখন তাহাই শুনে । অতিঅল্পদিন মধ্যেই গোপাল বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিলেন, অধিকার উপর কোন গুরুত্ব মিথ্যা অভিযোগ অর্পিত করাই স্থির হইল । সে অভিযোগ কি ? এ সম্বন্ধে বিজয়ের পরামর্শ লওয়া হইল, শেষে

রটনা করা হইল যে “অম্বিকা রাজকুমার বিজয়ের পরম শত্রু, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে” এই রটনা মুহূর্ত্ত মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইল, বিজয়ের পিতার কাণে পেল, তিনি তখন অম্বিকাকে বাঁধিয়া আনিতে লক্ষ্য দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবই সকল রাজা ও জমীদারের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিজয়ের পিতা উমাচরণের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় না থাকিলেও নবাববাহাদুরের নিকট যে উমাচরণের প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্রের প্রথম যুক্তিতে স্থির হইল যে অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হউক, নবাব বাহাদুর বেক্রপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন তাহাই সকলের নিঃসন্দেহ অনুমোদনীয় হইবে। সকলে একমত হইয়া তদুপেই হতভাগ্য অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, কিন্তু সেখানে এমন কেহ ছিল না, যে অম্বিকার আশ্বাতি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে আমরা নিশ্চয় জানি অম্বিকার তখনও আশ্বাতি হয় নাই। ভাগ্যহীন নির্দোষী অম্বিকা সুনির্ভল হৃদয়ে দুর্নিবারণ হৃদয়গত উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিরক্তাকে ভাল বাসিয়া মগা-পাপ করিয়াছে, আজি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৈঠক মাসেব প্রথম রৌত্রে, অনশনে, বন্ধীভাবে, মুর্শিদাবাদভিমুখে রক্ষিবর্গ সমভিব্যাহারে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—::—

জুখে সুখ ।

অধিকাচরণ প্রস্থান করিলে গোলাপচন্দ্র বলিলেন, “এ মোকদ্দমার ভাধির করিতে আমার মুর্শিদাবাদ যাওয়া বিধেয় ।”

উমাচরণ বলিলেন “তাহাতে সন্দেহ কি ? কল্যা প্রভুকে রওনা হইবে, বেহারাদিগকে বলিয়া রাখ যেন তাহার প্রস্তুত থাকে ।”

গোপাল । যে আজ্ঞা ।

উমা । বাহাতে ও পাঞ্জি আর এ দেশে না আসিতে পারে তাহা যেন করা হয় ।

গোপাল । তাহাত করা চাই-ই ।

উমা । অর্থ ব্যয়ের অন্য কুণ্ঠিত হইও না, প্রধান কাজিকে হাভ করিবে, নবাব ত কিছুই দেখেন না ।

পাঠক ! আমুন আপনাকে ঠিক এই সময়ের আর একটা ঘটনার কথা বলি, এখানে গোপালচন্দ্রের রাজার সহিত যে সময়ে কথাবার্তা হইতেছে, সেই সময় তাহার বাটীর পার্শ্ববর্তী পথে একটি শৌচনীর ঘটনা ঘটয়াছে ।

রক্ষীগণ অধিকাচরণকে মুর্শিদাবাদ লইয়া বাইবার সময় গোপালচন্দ্রের বাটীর পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া লইয়া বাইতেছিল, তাহার বদ্যাপি ভিতরের কথা জানিত, তদ্ব্য হইলে নিশ্চয়ই সে পথ দিয়া লইয়া বাইত না, কিন্তু দৈব ঘটনা প্রযুক্ত এ কথা কেহ জানে না ।

পাঠক! বোধ হয় অবগত আছেন যে আমাদের এক প্রান্ত-
ভাগে গোপাল চন্দ্রের বাটী, গোপালের বাটীর পার্শ্ববর্তী পথটি
অতি নিম্নার্জন; প্রায়ই সে পথ দিয়া লোকের যাতায়াত নাই,
আজি সেই পথ দিয়া রক্ষীগণ অস্থিকাকে লইয়া যাইতেছে।
অস্থিকার বদন বিশুদ্ধ, মুখস্তাব মলিন ও বিষাদ স্ফুট, অস্থিকা-
চরণ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহার যে একটা কোন বিশেষ
অনিষ্ট ঘটিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অস্থিকা
গোপালের বাটীর নিকটস্থ হইয়া যেন তাহার সকল দুঃখ বিস্মৃত
হইলেন, মনে করিলেন “হে ভগবান, এদময়ে যদ্যপি এক-
বার বিরজাকে দেখাও তাহা হইলে বোধ হয় আমার সকল
দুঃখ নিবারণ হয়, আমি সকল কথা ভুলিয়া যাই।” কিন্তু দেখুন
কি দরিদ্র অস্থিকার কথা শুনিবেন?

অস্থিকা বিষয় অন্তরে, উদ্বিগ্ন চিত্তে এক দৃষ্টে গোপালের
বাটীর নিকট গেলেন, বাটী শেষ হয়, যে আশার দামিনী ছটা
মধ্যে মধ্যে অধিবার বিষাদরূপ তমসাস্ফািন্ন হৃদয়ে মূঢ় আলোক
বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা বুঝি স্থির হয়,—অস্থিকার হৃদয়
বিকীর্ণ প্রায় বিরামকে হয়ত আর দেখিবেন না, তাহার সমস্ত
আশার মূল, মূর্ত্তিবন্তী প্রেমরূপিনী বিরজাকে আর দেখিবেন
না, এদুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, অস্থিকার ঢকু এতক্ষণ
শুষ্ক ছিল, এখন সজল হইল, যে স্বপ্নর ক্ষণে ক্ষণে আশার
ডরঙ্গে উবেলিত হইতে ছিল, তাহা যেন মল্লভূত হইয়া
আসিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা খিড়কীর দ্বার উদ্ঘাটিত
হইল, একটি অপক্লপ রূপময়ী স্থিরবোবনা রমণী আলুলায়িত
কেশে, বিগলিত বেশে, দৃষ্টিহীন নয়নে উন্মাদিনীর ন্যায়

অম্বিকাকে আলিঙ্গন করিয়া সরোদনে বলিল “প্রাণেশ্বর!
অম্বিকা, কোথায় যাও, আমার কোথায় ফেলিয়া যাও।”

দূরে প্রতিধ্বনি যেন বিজ্ঞপ্ত করিয়া বলিল “আর কোথায়
যাও।”

অম্বিকাচরণ জ্ঞান শূন্য স্তম্ভিতের ন্যায় বিরজাকে আলি-
ঙ্গন করিয়া বলিলেন “বিরজা!”

চক্ষু জলে উছলিল, কণ্ঠরোধ হইল।

বিরজা একদৃষ্টে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া সরোদনে কহিল
“অম্বিকা।”

অম্বিকা। কেন বিরজা?

বিরজা। তুমি কোথায় যাও, আমার লইয়া চল।

অম্বিকা। তুমি কোথায় বাটবে বিরজা?

বিরজা। তুমি যেখানে যাইবে।

অম্বিকা। আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির কি, হয়ত
যমালয় আমার নিশ্চিষ্ট স্থান।

বিরজা সদন্তে কহিল “না হয় আমারও তাহাই হইবে।”

অম্বিকা স্নেহে বিরজার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন
“এখন আসি, যদি ঝাটিয়া থাকি, যদি কখন ঈশ্বর মুখ
তুলিয়া চান, তবে দেখা হইবে, নতুবা এই শেষ! তোমার
পিতা যদিও এখন আসিয়া পড়েন তাহা হইলে আরও
অনিষ্টগাতের সম্ভাবনা।”

রক্ষাণ এতক্ষণ চিত্তাঙ্গিত পুস্তলিকাদে নিশ্চেষ্টভাবে
দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,

“গোপালচন্দ্র যদি আসে।” এই ভাবিয়া ভাহাদের সে জ্ঞান তিরোহিত হইল, বলিল “আয় নয় চল।”

অম্বিকা। বিরজা তবে আসি।

বিরজা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, তরল জন্মের সে প্রবল শোকের বিষয় বর্ণনা করা দুষ্কর, বলিল, “হায় এই হত-ভাগিনীই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ।”

অম্বিকা। না বিরজা ওকথা বলনা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সর্বস্ব—তুমি আমার স্বপ্ন, তুমি আমার জ্ঞান।

অম্বিকা আবার রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিল, বিরজা নির্নিমেষ লোচনে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশ্রু-নীরে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে অম্বিকা প্রকৃতই দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বিরজা তখন খীর জন্মরসনিরে সেই দেবচিত্র অঙ্কিত করিয়া অশ্রু-নীরে বক্ষস্থল বিধৌত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—ঃ—

কল্পনার বিকাশ।

খাসময়ে গোপালচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ ও বিরজা প্রভৃতি সকলে মুর্শিদাবাদে চলিলেন—সকলেরই মুর্শিদাবাদ বাইবার উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু বিরজা যে কেন বাউড়েছে তাহা সে জানে না, না বাইবার জন্য কত নিঃস্বচ্ছন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু, গোপাল-

চক্ষু ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন, “বিরজা তোমার বৈরাগ্য মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে তাহাকে দেশ ভ্রমণ ব্যতিরেকে তাহার উপশম হইবে না।” কিন্তু বিরজা মনে মনে বলিল “দেশ ভ্রমণে তাহার উপশম হইবে না- তবে পরলোকে যাইলে হইতে পারে।” বাহাই হউক বিরজা আজি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। বাহার হৃদয় বিষণ্ণ, বাহার মনে সুখ নাই, তাহাকে নন্দনকাননে লইয়া যাও সে সুস্থ হইবে না, সুতরাং মুর্শিদাবাদের রমণীয়তা যে বিরজার প্রাণে কিছুমাত্র সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিল না, অথবা সেই বিকৃতভাবাপন্ন হৃদয়ের কিছুমাত্র উপশম সাধন করিতে সক্ষম হইল না তাহা নিশ্চয়। আমরা বলি বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। আজি বিরজা বিজয়চন্দ্রের বাটীতে রহিয়াছে, সেই পাখণ্ড, বাহার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাহার ইহ জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়াছে, বাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য একটা হতভাগ্যের ইহজীবনের সমস্ত আশালতা শুষ্ক হইয়াছে, আজি বিরজাকে শত অনিচ্ছা বস্ত্রেও সেই পাখণ্ডের মুখাবলোকন করিতে হইতেছে। সুযোগ পাইলে বিজয় বিরজার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিরজা হৃৎথে রাগে ত্রান বদনে তথা হইতে চলিয়া যায়। ইহ অগতির একমাত্র সহায় গোপালচন্দ্রকে বলিলে তিনি তাহার কোন প্রীতিউত্তর দেন না। বিরজার আর উপায় নাই, বিরজার ইহ অগতে অন্য সহায় নাই, হৃৎথ জানাইবার স্থান নাই—কিন্তু বিরজা জানিত, বেংলোরের জেষ্ঠ, সকলের শ্রদ্ধা, অমাধ সহায় একজন আছেনই আছেন, বিরজা অবিরত সৃজল নগরে দীক্ষিতাবে

তাঁহারই নিকট আপন দুঃখের কারা কঁাদিত। কিন্তু লোকেও তাঁহার কার্য্য দেখিতে পায় না, অনুভব করে, কিন্তু আজিও হতভাগিনী বিরজার সে অনুভবের সময় উপস্থিত হয় নাই!

ঐশ্বকাল, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, বিরজা আপন শয়ন বস্ত্রের খটোপরি শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে। বিরজা রোদন করিলে বিজলী নিশ্চিত থাকিত না, নানা উপায়ে মন্যমানা কোশলে নানা প্রকারে সাহসনা করিত, কিন্তু এসময়ে বিজলী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং বিরজা আপন মনে অঝোরে কঁাদিয়া আপন মনোভাব লাঘব করিতেছে, এমত সময়ে তথায় গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিরজাকে রোদন প্রায়ণ্য দেখিয়া ক্ষণেক নির্ণিমেষনয়নে তাহার প্রতি টাহিয়া রহিলেন, বিরজার অপরূপ রূপ মাধুরী একে একে তাঁহার নয়ন পথে আবিস্কৃত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন “মা আমার রূপে লক্ষী গুণে সরস্বতী—এরূপ কি পামর অধিকার পূর্ণকূটীরে শোভা পায়? ইহা রাজার ঘরে শোভা পাইবে।”

বিরজা এখনও তাঁহার পিতাকে দেখে নাই, সে এখনও এক মনে কঁাদিতেছে, গোপালচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন “বিরজা, মা কঁাদ্‌চ কেন?”

বিরজা চমকিয়া উঠিল, দেখিল, সম্মুখে পিতা দণ্ডায়মান, ললব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিল, সেই গোলাপী অধরে সহস্র রক্তের সঞ্চার হইল, সেই অতুলরূপের অগ্নিক পরিবর্তন যে কত মধুর, তাহা বর্ণন করা হুহুহ।

বিরজা গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া অশ্রুবৎ সঞ্চরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, বরং অশ্রুধারা পূর্ণাপেক্ষা প্রবলতর বেগে প্রবাহিতহইতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র পুনরপি বলিলেন “বিরজা কাঁদু কেন?” বিরজা সে কথার কোন প্রতি উত্তর দিতে পারিল না, বস্তুতঃ তাহার সেই নয়ন বারি তাহার যে উত্তর দিতে ছিল তাহা নিছকী ভাবার ব্যক্ত হয় না, কিন্তু গোপাল পাষণ্ড, আপন অতিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই পাগল, সে কেন একজন অনাধিনী অভাগিনীর নয়ন জল দেখিয়া বিকলচিত্ত হইবে?

গোপাল কহিলেন “ছি মা কেঁদনা, কান্না কেন?”

বিরজার মুখে কথা আসে আসে আসেনা, মূণ কুটে কুটে কুটে না। বিরজা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা সরিল না, কর্তৃকৃত্ত হইয়া আসিল।

তখন গোপালচন্দ্র বলিলেন “বিরজা তুমি বালিকা, আমি যে তোমার মুখ সৌভাগ্যবুদ্ধির জন্য কত চেষ্টা করি তা তুমি কি জানিবে? যখন বয়স হইবে, জ্ঞান হইবে, ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে, তখন বলো যে আমি নিজের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই ভাল কর্ত্তি কি না।”

বিরজা চমকিয়া উঠিল, তাহার আগদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, ভালু শুদ্ধ হইয়া আসিল, শরীর কণ্টকিত ও চুদকম্প উপস্থিত হইল। বিরজা কোন কথা কহিতে পারিল না।

“মোনং সন্মতি লক্ষণঃ” বুঝিয়া গোপালচন্দ্র বিরজার পাশে উপবেশন করিয়া কহিলেন, “কাল দিন ভাল আছে, কাণ্ঠেই বিবাহ দিব।”

কবে বিবাহ হইবে না হইবে তাহা না জামিয়া বিজ্ঞা যে উৎকর্ষারূপ আখ্যাসের ক্রকুটী ভঙ্গি সহ্য করিতে ছিল তাহা একক্ষণে তিরোহিত হইয়া ততোধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে দেশে বিচার নাই, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, পরের হস্তে বল পূর্বক সমর্পণ করিলেই বিবাহ হয়, সে দেশে গোপালচন্দ্র বিজ্ঞাকে বিজ্ঞের হস্তে সমর্পণ করিলে আর উপায় কি ? বিজ্ঞা কি বলিবে ? আশ্রমীয়ে ভাসিতে ভাসিতে হয়ত বিজ্ঞাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিজ্ঞা এইরূপ নানাবিধ ভাব অমঙ্গল স্মরণ করিয়া, আতঙ্কে শিহরিতে লাগিল।

বিজ্ঞার হৃদয় এখন স্তম্ভিত, যে বিজ্ঞা একক্ষণ আকুল নয়নে রোদন করিতে ছিল, সে বিজ্ঞার চক্ষে এক্ষণ আর ঘল নাই, বিজ্ঞা নির্ঝাঁক নিস্পন্দ, কিন্তু তাহার হৃদয়ে চিন্তা ও আতঙ্কের বোউত্তাল তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে ছিল তাহার নিকট ঘোর ঝটিকা কালিন তরঙ্গমালা সমাকুল পারাবার বক্ষণ পরাস্ত হয়।

গোপাল বিজ্ঞার রোদন ভঙ্গের কারণ তাঁহার প্রদত্ত সুস্বাদু কেই নির্দেশ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রবল শোকোচ্ছাস মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেন নূতন বেগে বলীয়ান হইয়া সহস্রধারে উজ্জলিয়া উঠিল। যে রোধ প্রবল স্রোতে ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল,—বিজ্ঞা আবার অঝোরে কাঁদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শান্তি।

বিরজা একাকিনী অঝোরে কাঁদিতেছে, এমনত সময় তখার বিরজার প্রিয় সখি বিজলী অসিয়া উপস্থিত হইল, বিজলী কণেক নিশ্চেষ্টে ভাবে বিরজার পার্শ্বে বসিয়া রহিল, তখন বিরজা একবার স্থির দৃষ্টিে বিজলীর প্রতি তাকাইল, বিজলীকে দেখিয়া বিরজার শোক যেন শত ধারে উধাশিয়া উঠিল।

বিরজা বাম্পক্ক কণ্ঠে বলিল “সই।”

বিজলী। কেন সই, কাঁদে কেন ?

বিরজা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

বিজলী কণেক স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, পরে বিরজাকে নানা প্রকারে শাস্তনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিরজা উন্মাদিনীর ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া রোমন করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিজলীর বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় কি ? এ সংসারে বিরজার কাঁদিবার—দুঃখ জানাইবার একমাত্র স্থান বিজলী—বিজলী বিরজার শান্তি, বুদ্ধি ও উপায়, আজি সেই বিজলী তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই দি়র করিতে পরিতেছে না।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বিরজা বলিল “সই কি হবে ?

বিজলী। উপায় ত দেখি না।

বিরজা ভ্রুকৃষ্ণ করিয়া বলিল “কি, উপায় নাই, তবে কি আমার এই পিঁশাচের পত্নী হইতে হইবে ?

বিজলী নিশ্চয় ।

বিরজা সৰুৰূপে আবার কহিল, “সই আর কিছু না পার
বৃত্যতেও কি সহায়তা করিতে পারিবে না ?”

বিজলী বিস্মিত হইয়া কহিল “তুমি মরবে ?

বিরজা । তাহাভে কি সন্দেহ আছে ?

বিজলী কাঁদিয়া বলিল “এমন কপালও করে ছিলে ?
কিন্তু না সই তোমার আমি এ কচি বয়সে মরিতে দিবনা, ইহার
উপায় করিব ।”

“বিরজা । কি উপায় ?

বিজলী । সে কথার এখন কাজ কি, পরে জানিতে পারিবে ।

এই বলিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল ।

বিরজা । কথার বাইবে ?

বিজলী । এখন কোন কথাই নয় ।

বিজলী চলিয়া গেল । বিরজা সোৎসুক চিত্তে অবাধ হইয়া
রহিল ।

সন্ধ্যার সময় বিজলী ফিরিয়া আসিল । বিরজা তাহাকে
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, ভয়, “শাছে
বিজলী কোন মন্দ সংবাদ দেয় ।

বিজলী একবার তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু ছইটা দিয়া পূর্ণ
দৃষ্টিতে বিরজাকে দেখিয়া বলিল “বিরজা, সই—”

বিরজা বিজলীর দিকে তাকাইল ।

বিজলী । আমি তোমার উদ্ধার করিব ।

বিরজা । পারিবে ?

বিরজা । নিশ্চয় ।

বিজলী। কি করিতে হইবে ?

বিজলী। কিছু না, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা বাও।

বিরজা কিছুই বুঝিল না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া নিশ্চর হইল।

বধা সময়ে সকলে আহাৰাদি করিয়া নিদ্রাগত হইলেন রজনী ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আসিল। যখন নিদ্রা দেবীর শাস্তিময়ী সূৰ্ণ অঙ্কে সকলেই সুষুপ্ত ; কোথাও কোন শব্দ নাই, প্রকৃতি নিশ্চর, পৃথিবী বৃষ্টি অচেতন—বাবতীর জীব মৃত ; এমন সময় বিজলী ধীরে ধীরে বিরজার শব্দ্যার বাটয় তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, দেখিল বিরজা আগরিতা,—চমকিয়া বলিল “সই !”

বিজলী মুহূর্ত্তেরে বলিল “শব্দ্য হইতে উঠ, আমার সহিত আইস।”

বিরজা একটি কথাও না কহিয়া তাহাই করিল। উভয়ে নিঃশব্দে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাধারণ জনগণে উপস্থিত হইল।

তখন বিজলী বলিল “কোন কথা কহিও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।”

বিরজা তাহাই করিল।

—

নবম পরিচ্ছেদ ।

ইহা কি স্বপ্ন ?

উভয়ে এই রূপ নিত্যক ভাবে অনেক দূর বাইরা বিরজা আর থাকিতে পারিল না, একটি দীর্ঘ নিশাস ত্যাগ করিয়া বলিল “আমরা কোথায় যাউতেছি ?”

বিরজা। যে দিকে চক্ষু যায়।

বিরজা। আমরাও চালাই, কিন্তু এসময়ে একবার অবশ্যক কি দেখিতে পাই না ?

বিরজা। সে পরের কথা, এখন ত বিরজাকে বিবাহ করিতে এড়াও।

বিরজা একটি দীর্ঘ নিশাস ফেলিল, বিরজা দেখিল বিরজা কাঁদিতেছে, বলিল “সই কাঁদে।”

বিরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে কাঁদিতেই লাগিল।

বিরজা। সই কেঁদে না, কাঁদিলে আমি তোমার সঙ্গে বাইব না।

বিরজা অবাক হইল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না।

আরও কতক দূর বাইরা উভয়ে একটি প্রকাণ্ড মাঠে পড়িল। বিরজা বলিল “সই দেখ দেখি, টাঘের আলোর মাঠের কি অপূর্ণ শোভা হয়েছে !”

বিরজা একবার চতুর্দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার ভাষা ভাল না লাগায় আর কোন কথা কহিল না।

উভয়ে ক্রমশঃ একটা বুক সন্নিহিত উপহিত হইল ।

বিজলী ভাতি বিহ্বল স্বরে কহিল "সই, গাছ তলার কে দেখেছ ?"

বিরজা । মাহুঘ ।

বিজলী । কি জানি মাহুঘ কি ভূত ।

বিরজা । এত রাত্রে এখানে মাহুঘ কেন ?

বিজলী । বলতে পারি না, আর এই ভিন্ন ত পথ নাই, কি কর্বে কর ।

বিরজা । চল বাই ।

বিজলী । আমি যাব না, তুমি আগে গিয়ে দেখে এস ।

বিরজা একবার বিজলীর বদন প্রতি চাহিল, বলিল "সই তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেন ?"

বিজলী । কেন তুমিত ভাই মরতে স্বীকার হিলে, এখন 'ঐ গাছ তলার একাকিনী বেতে ভয় পাচ্ছ কেন ? আর এখন ভয় করিলেই বা চল্বে কেন ?

বিরজা আর একটা কথাও না কহিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল ।

বিরজা বৃক্ষের নিকটবর্তিনী হইলে মানবটী তাহার নিকটে আসিল। চতুর্কিরণের সহায়্যে বিরজা তাহার আপাদ মস্তক বেশ দেখিতে পাইল । বিরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তাহার জ্ঞান অপনোপনের উপক্রম হইয়া উঠিল । মানবটী বিরজাকে অটুলজন করিয়া বলিলেন "বিরজা, বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা ।"

বিরজা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার নয়ন দিয়া

অবোধে অন্ধ নিপতিত হইতে লাগিল, তখন তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন “ইহা কি স্বপ্ন ?”

দশম পরিচ্ছেদ ।

—•••—

নবজীবন ।

বিয়লী অধিকার বদন প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল ।

অধিকাচরণ বিয়লীর মুখ চুখন করিয়া কহিলেন “কি বিয়লী !”

বিয়লী । অধিক, আমার যে এ জীবনে তোমার দেখা পাইব সে আশা ছিণ না, তাই তুমি বস, আমি তোমার কোলে শুই, তুয়ে তুয়ে তোমার মুখ খানি দেখি ।

অধিকাচরণ তাহাই করিলেন ।

একত সময়ে বিয়লী তথায় উপস্থিত হইল, বলিল “একি এ যুগল মিলন কিরূপে হল ।”

‘বিয়লী উঠিয়া বলিল, বিয়লীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল ‘তোমারই কুপার ।’

বিয়লী মুহু হাসিয়া সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল “রাত্রি আর অধিক নাই, আক্ষেপের এখনি দাড়া করা কর্তব্য ।”

অধিকা । চল—মৌকা প্রস্তুত ।

বিরজা । গঙ্গা এখান হইতে কতদূর ?

অধিকা । অতি নিকট ।

সকলে ভাগিরথী দিকে চলিলেন, বিরজার মনে তখন যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল, তাচা বলা যায় না । তাহার হৃদয় আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে ফীত হইতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল ; মনে হইতে ছিল “অধিকা আমার হইবে এমন কপাল কি করিয়াছি” কখন কখন মনে মনে ঈশ্বর সমীপে কত কাকুতি, কত মিনতি, কত প্রার্থনা করিতেছিল ; এমন সময়ে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল, তথায় একটা নৌকা ছিল, তিন জনে নৌকার আরোহণ করিল,—একটানার নৌকা সবেগে ছুটিতে লাগিল ।

ঊই দিবস পরে সকলে কাল্‌নায় উপস্থিত হইলেন ।

অধিকাচরণ দুই চারি দিবস কাল্‌নায় অবস্থিত করিলেন, তথায় যথা রীতি তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল । বিরজার আত্মাদের পরিসীমা নাই—বিজলীরই বা কত আনন্দ ; তাঙ্গরা যেন নূতন পৃথিবীতে আসিল ।

কাল্‌নায় কোন প্রকার সুবিধা না দেখিয়া তাঁহারা তথা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন । অধিকাচরণ তথায় ক্রমে কৃষ্ণনগরাধিপতির সন্তিত পরিচিত হইলেন ।

সহরাজ বিশেষ গুণগ্রাহী লোকভিলেপ, অধিকাচরণের গুণগ্রাম দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন পারিষদ রূপে নিযুক্ত করিলেন, অধিকা রাজ প্রসাদে সপরিবারে সুখে কালান্তিগত করিতে লাগিলেন । বিরজার আর সুখের পরিসীমা নাই ।

বিরজাও নানা প্রকার কারুকার্য জানিত । মহারাণী সেই অন্য তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন । ক্রমে তাঁহারী স্ত্রীপু-
 ক্ৰমে রাজা ও রাণীর বিশেষ প্রকার পাত্র হইয়া উঠিলেন ।
 তাঁহাদের ভবসাজাদিত আকাশ পটে সুখ সুখ্য সমুদিত হইল ।

বিবাহের দুই বৎসর পরে বিরজার একটা সন্তান জন্মিল ।
 মহারাজ এই উপলক্ষে অধিকার নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য
 উপহার প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং সন্তানটির নাম বিভূতি
 ভূষণ রাখিলেন । বিভূতি দিইন দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন
 অপরূপ রূপ লাভণ্য ও সৌন্দর্য্যসকলের বড়ই ভালবাসার পাত্র
 হইয়া উঠিল ।

এতদিনে অধিকা বিরজা ও বিজলী পূর্ব হুঃখ সকল বিস্মৃত
 হইলেন ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

রাজার কথা ।

বিরজা ও বিজলীর নিকৃদ্দেশের পর দিন প্রাতঃকালে
 গোপালচন্দ্র দেখিলেন যে বিরজাও নাই বিজলীও নাই, নানা
 স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান
 পাওয়া গেল না । গোপালচন্দ্র হতাশ হইলেন, তাঁহার আশা-
 লতা বঞ্চিত হইল ।

বধাসময়ে সংবাদ আসিল যে অধিকাচরণও নিরুদ্দেশ—
তখন আর কাহারও প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকি রহিল না।
অগ্নিতে স্থতাহতি দিবার ভায় গোপালচন্দ্রের ক্রোধান্বিত
হইয়া উঠিল। তিনি বিজয়চন্দ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ মহামাত্র
কাজির নিকট গেলেন, কাজি বলিলেন “অমুসন্ধান না পাইলে
কি করিব।” অমুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল
না।

বিজয়চন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া নন্দনপুরে প্রত্যাগমন করি-
লেন, গোপালচন্দ্রও তাঁহার সহিত আসিলেন। বিজয়ের সহিত
গোপালচন্দ্র যে সশব্দের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা সহসা
ছিন্ন হইল।

গোপালচন্দ্রের মনে বড় ধিকার হইল। তিনি শপথ করি-
লেন যে বিরজাকে আর কত্কা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সেই
দিবসই তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং
অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার দ্বারা পরিগ্রহ করিলেন।
তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তির এক ঋণদ্রব্যও বিরজা না
পায়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই অভিপ্রায়েই তিনি বিবাহ
করিলেন।

গোপালচন্দ্র একটা চতুর্দশ বর্ষিয়া যুবতীর পাণিগ্রহণ করি-
লেন, তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী দেখিতে মন্দ নয়, মধ্যাকৃতি
উজল ভ্রামশর্প, উন্নতনাসিকা, চক্ষু দুইটা যেমন বিদ্যুৎ
ভেম্বর, মনোহর, — ললটি কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ক্রস-
মস্ত্রের ঠিক উপরিভাগটি। রমণীর নাম বেকাদা সূন্দরী।
যোদ্ধার সহিত গোপালচন্দ্রের প্রণয় হওয়া অসম্ভব, বৃদ্ধ ও

বুবতীতে প্রায় প্রায়ই হয় না, কিন্তু গোপাল তাহা মানিতেন না। তিনি তাহাকে কত সোহাগ করিতেন, কত প্রকারে ভালবাসা দেখাইতেন, ইচ্ছা যে মোক্ষদা তাঁহাতে একান্ত অসু-
রক্ত হটক ? কিন্তু বাচিয়া প্রেম ও বসিয়া রূপ কি হয় ?

* * * *

আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল বিজয়া নিরুদ্দেশ এবং গোপালচন্দ্র বিবাহিত হইয়াছিলেন। গোপালের পত্নীর বয়স এখন বিংশতি বৎসর, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই, হয়ত মোক্ষদার আশ্রিত সন্তানাদি হইবেন। কিন্তু বয়স বাড়িতেছে গোপালচন্দ্র ততই উদ্বিগ্ন হইতেছেন, সস্তাষ হইবার আশা ততই কমিতেছে। এই ছয় বৎসর মধ্যে গোপালচন্দ্র এক দিবস ভ্রমেও বিজয়ার নাম স্মৃধে আনেন না, গোপালচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কাজির নিকট হইতে অধিকাচরণের গেল্টারের সংবাদ লয়েন কিন্তু কোন সম-
য়েই সন্তোষ জনক সংবাদ প্রাপ্ত হন না।

বিজয়চন্দ্রের সহিত গোপালচন্দ্র যে সখ্যের আশা করিয়া ছিলেন, অনেক দিন হইল যে আশা গিয়াছে, কিন্তু বিজয় এখনও বনিষ্ঠতা ছাড়েনা। বিজয় প্রায়ই গোপালের বাটীতে বেড়াইতে আসেন এবং পান খাইয়া বসেন, কিন্তু এ বনি-
ষ্ঠতা গোপালচন্দ্রের ভাল লাগে না, অধচ বসিতেও পারেন না। বাটীতে বুবতী ভাষা, গোপাল কখন থাকে কখন না থাকে, এ অবস্থার আত্মীয়তা দেখাইতে বিজয়ের তাঁহার বাটীতে বাওয়া অনায়াস, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝেনা গোপালচন্দ্রের ইহাই কুঃখ !

—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—*—

নবম্বর ।

আজি প্রায় বৎসরাবধি হইল, বিরজা পূর্ণাপেক্ষা সমগ্রিক দুর্দ্বল ও ক্লান্ত হইয়াছেন। চিকিৎসকের মত যে তিনি কিছু দিবস নৌকা করিয়া জল পথে ভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই ক্রপই করা হইল। বিরজা আজ সপ্তাহাবধি জল পথে ভ্রমণ করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরাধিপতিও ঠিক এই সময়ে নৌকারোহণে তীর্থ যাত্রায় যাইতে ছিলেন, সঙ্গে সতন্ত্র নৌকায় সপরিবারে অধিকা-চরণও যাইতেছিলেন। মুর্শিদাবাদ পৌছবার অনেক পূর্বে হইতে অধিকাচরণ বিশেষ সতর্ক হইলেন, তিনি পূর্বের ম্যায় অ... নৌকার বাহিরে আইসেন না, সতর্ক ভিতরেই থাকেন। পাছে কেহ কিছু মনে করেন--সেই জন্য তিনি পূর্বে হইতে সকলের নিকট আপন শারীরিক অসুস্থ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দৈব দুর্ভিক্ষকে অধিকার ঘোর শত্রু নয় পিণ্ডাচ বিরজা-চন্দ্র ঘটনাক্রমে সেই দিকে জল পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি নৌকা হইতে অধিকাচরণকে দেখিয়া তখনই তাঁহার অনিষ্ট স্থানে যত্ন পরাইলেন।

কিন্তু অধিকা চরণ জানিতেন যে নৌকা মুর্শিদাবাদের ঘাটে লাগি - হইবে না, তথাপি তিনি তথায় পৌছবার পূর্বে হইতে

বীর নৌকা রাজ নৌকা হইতে আর দুই ক্রোশ পশ্চাতে রাখিলেন। তিনি মনে করিলেন মহারাজা মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে হয়ত নবাব সরকার হইতে কেহ না কেহ তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে আসিবে, অতএব সে সময় নিকটে থাকিলে কি জানি যদি তাহার জানিতে পারে, তাহা হইলে আবার বোর শকট উপস্থিত হইবে।

অধিকা এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব কাহিনীর বিন্দুমাত্র মহারাজাকে বলেন নাই, কেন বলেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অধিকা মনে করিয়া ছিলেন কি জানি একথা শুনিলে মহারাজ যদি তাহাকে নাবাদের ভয়ে আশ্রয় না দেন।

নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া অধিকা আপন নৌকা মহারাজের নৌকা হইতে অনেক দূরে রাখিলেন, এবং স্বয়ং তন্মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিলেন। তিনি বিচ্যুত জানিতেন যে এরূপ গুপ্ত ভাবে যাইলে কেহই তাঁহার বিষয় জানিতে পারিবে না। বস্তুতঃ তিনি যে রূপ সতর্ক ভাবে যাইতে ছিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে চিনিবে, বা তিনি যে নৌকায় যাইতেছেন তাহা বিবর কেহ জানিবে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু ভবিষ্যত অথগুহ্য, এইটুকু থাকিলে কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে—তাহার সতর্কতা। এতদুপেক্ষাই তাহার নিকট পরাত হই, কখনো কখনো “নাট্য-কুড়ে কাটে সাপ নাড়ুন নরেন্দ্র।”

বস্তুতঃ মহারাজের তরফী সমূহ মুর্শিদাবাদে অতিক্রম করিয়া ইতিমধ্যে অধিকার নৌকা যাইবে। মহারাজ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিতে আর বিলম্ব আছে এমন সময়ের গন্ধবন্ধ বিচার করিয়া কতিপয় নৌকা সবেগে অধিকাচরণের

দিকে আসিতে লাগিল। বিজলী ভয়ময়ী সে সংবাদ অধিকাচরণকে দিলেন, অধিকা কল্পিত রূপে তত্বে তাবে নোকার গবাক দিয়া গুপ্ত তাবে দেখিলেন, কোন আদি অমঙ্গল সম্পাত হইবে তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। বিরজার সর্বোচ্চ বদন শুকাইল, সেই ইন্দ্রিয় তুল্য নয়ন দুগল সম্বল হইল, অধিকা বিরজার বদন প্রতি তাকাইলেন, তাহার মুখ তাব দেখিয়া তাঁহার বড় ক্রোধ হইল, হৃদয় ফাটিয়া বাইতে লাগিল, মৌখিক সাহস সহকারে বলিলেন “তব কি বিরজা।”

বিরজার চক্ষু দিয়া জল পড়িল, বিরজা সজল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রায় বিংশতি জন সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে নোকা সমেত ধরিয়া লইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা দর্শনে অভাগিনী বিরজার মুচ্ছা হইল, প্রিয় সহচরী বিজলীর গুপ্তবার মোহাগনোদন হইলে দেখিল অধিকা। তথায় নাই, বিভূতি ভূষণ মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বদনের নিকট স্বীয় বদন ধানি ন না “মা মা” বলিয়া ডাকিতেছে ও অধোরে কাঁদিতেছে।

যত বয়ীর বালকের জ্ঞান আছে কি? কিন্তু বালককে দেখিলে তাহার যে সে সমস্ত সুকিয়ার বেশ ক্ষমতা আছে তাহা সহজেই হৃদয়কম হয়। বালকের আকুল নেত্রের জল দেখিলে পাষণ্ড হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। কিন্তু কি কেবল মাতার কন্দন দেখিয়া কাঁদতেছে? না, তাহা নহে, তাহা হইলে কেবল “মা মা” বলিয়াই কাঁদিত, কিন্তু বিভূতি একবার বা “মা ওঠ, মা” বলিয়া নয়নজলে ডাকিতেছে, আবার কখন, “বাবা, বাবা” ডাকায় গেল মা, কে আবার বাবারে ধরেনিয়ে গেল মা, আদি

যে বাবার কোলে বাব।" আবার কখন কখন বলিতেছে "বড় মা" বিভূতি বিজলীকে "বড় মা" বলিত, "বড় মা আমার বাবা কোথা গেল ? আমার বাবা কই বড় মা !"

বিব্রজা চক্ষু উন্নীলন করিয়া একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল "অধিক, অধিক, অধিক কই ! বিজল, সেই আমার, অধিক কোথায় ? বড় আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বিজলী তাহার কোন উত্তর দিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন বাহিহী তাহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—+—

বিচার ।

বিজয়চন্দ্র মূর্খিনাবাদ পৌছিবার পূর্বে অধিকাচরণকে প্রেস্তার করিবার আদেশ বা উপদেশ যে কোশল ক্রমে পূর্ব হইতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে মহারাজ বাহাছর বন্দী সময়ে বিচারের দ্রষ্টব্যে না পাইয়া মনে করিলেন অধিকাচরণের তীর্থ যাত্রার বাধা ছিল না, তাহাই আসেন নাই, কেননা আসিবার পূর্বেও তিনি একবার ঐ রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাহাই হউক যদি ঐ রূপ পলাইবার ইচ্ছাই ছিল তবে আসিবার কি প্রয়োজন ?

বলা বাহুল্য যে মহারাজ অধিকাচরণের উপর নিভৃত বিরক্ত
হইলেন । মহারাজী বিরক্ত না হইয়া হুঃখিত হইলেন । বির-
জাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না, আত্মি সেই
বিরজা তাঁহার সঙ্গে নাই, যে বিরজাকে তিনি আপন কন্যার
ন্যায় স্নেহ করেন ভালবাসেন, সেই বিরজা আসিলনা, ইহা কাত-
বিকই হুঃখের বিষয় । তাহাও না হয় হইল, মহারাজী বিভূতি
ভূষণকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিবেন, বিভূতিকে তিনি প্রাণ
তুল্য ভাল বাসিতেন । সে বিভূতিকে না দেখিয়া থাকিতে
যে তাঁহার মস্তান্তিক কষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য ।—তখনই
সেই বালকের সুন্দর প্রফুল্ল প্রবিজ্ঞতাময় বদন খানি তাহার মনে
পড়িত, তখনই তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তিনি তাহা নিবৃত্ত
করিতে অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা স্থলিত হইতে থাকিত ।

*

*

*

এদিকে রক্ষীগণ নৌকায় উঠিয়াই অধিকাচরণকে উত্তম রূপে
বাঁধিয়া লইয়া গেল । যাহার ইচ্ছা হইল, তিনি ছই চারিখা উত্তম
রূপে দিতেও ক্রটি করিলেন না । এ সময়ে হত ভাগিনী
বিরজা, মুচ্ছিতা, বিজলী বালক বিভূতিকে লইয়া শশব্যস্ত,
নিপাহীগণ বিশেষ সুবিধা পাইয়া যে বাহা পাইল আশ্রয়
করিল । বিরজা সর্বশান্ত হইলেন ।

অধিকাচরণের নৌকা এই দিগের নিকট আসিল
কাকূতি সিঁড়ি করিলেন, বলিলেন যে “তোমার একটু
অপেক্ষা হয়, বিরজার গান হইলেই বাইব ।” কিন্তু তাহার
সে কথা শুনিয়া, অধিকার চক্ষে জল আসিল, তিনি আবার
বিরজাকে বলিলেন যে “তবে একবার আমার বিভূতিকে

কোলে করিতে দাঁড়, আমি বিদ্যার কালে তাহাকে একবার
 আমার মত কোলে করি, একবার তাহার মুখ চুম্বন করি” কিন্তু
 পায়ত্তরা তাহাও তুলিল না, তাহাকে কোর করিয়া টানিয়া লইয়া
 গেল, বিজলীর প্রাণ কাটিয়া গেল, চক্ষু দিয়া সবগে অল আসিল,
 বিজলীর মুখ চুম্বন করিয়া মনে মনে বলিল “বিব্রজা তুমি,
 ভাগ্যবতী, তোমার এ ভরসার কথা ঘেঁষিতে হইবে না বলিয়াই
 কি মোহ হইল।”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

নিদ্রাকণ ঘটনা ।

বিব্রজার মোহ ভঙ্গ হইলে বিজলী এ সকল কথা আশ
 তাহাকে বলিল না, কেবল মাত্র বলিল যে অধিকারকে বিদ্যা
 লইয়া গিয়াছে। অধিকারকে ধরিয়া লইয়া বাইবার কিছুকণ
 পরে এক জন সিপাহী আসিয়া বলিল “অধিকা এখন বন্দী,
 তবুও বাবজীবন তাহাকে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে, সুতরাং
 তোমরা ইচ্ছামত বেগানে তাহাকে পালিত পার। সে মাত্র আজ
 অবহেলা করিয়া গলাইয়াছিল, তজ্জন্ত তাহার পাহার কামি
 বাইরেবের নিদ্রাট বিচার হইবে।”

সিপাহী এই নিদ্রাকণ সংবাদ দিয়া চলিয়া গেল, বিজলী
 ও বিব্রজা উভয়ে নিদ্রা অনেককণ মায়ের কাঁপিতে “বিল

বিরজা অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া একটা বাসা ভাড়া করিলেন। অধিকার অপরাধের কি বিচার হয়, তাহা জানিবার জন্য প্রাণ ওঠাগত। অধিকাকে যে আর দেখিতে পাইবে, সে আশা ত নাই। তবে যদি বিচারপতি সদয় হইয়া এই সামান্ত অপরাধের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড না করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল। কাজির অসাধ্য বিচার নাই, অসাধ্য কাজও নাই।

বিরজা নিজস্বাধার পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র বিভূতি-ভূষণ এখন তাহার শান্তি ও সন্তোষের স্থান, যখনই মন অত্যন্ত খারাপ হয়, অধিকার সেই বদন মাধুরী, সেই অকৃত্রিম প্রেম হৃদয় পটে উদ্ভিত হয়, তখনই বিভূতিকে কোলে করিয়া আকুল নয়নে কাঁদে ও তাহার বদন প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া থাকে।

এক দিন বালক বলিল “মা কাঁদ কেন?”

বিরজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “বাবা কেন কাঁদি তা যে তুমি জাননা।”

বিভূতি। আর কেননা।

বিরজা বালকের বিস্তৃত বদন দেখিয়া ক্ষণেক রোদন সঙ্কট করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। চক্ষু মানিল না। বালক উপায় না দেখিয়া মাতৃ গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা পুত্রে রোদন পরবশ হইলেন।

বালক বিভূতি আনন্দে নতুন নতুন “বাবা বাবা” করিয়া কাঁদিয়া বিরজা ও বিভূতিকে নেত্রাসারে ভাসাইয়া দেয়। তাহার অধিকার একবার হয়, হইলে আর রক্ষা নাই—বালক স্মার্ত-পথে বেল পিতাকে দেখিবার জন্য কাঁদে। মাতাকে, মাতৃ-হারা বিভূতিকে, তাহার পিতাকে দেখাইতে বসে। সে

সময়ে কেহই তাহাকে সাঙ্গনা করিতে সক্ষম হয় না। বালক কাহারও সাঙ্গনা মানে না, কাহারও কথায় ভুলে না। আহা, কখন আপনি মাতাকে, তাহার বড় মাকে, সাঙ্গনা করিতেছে, আবার কখন তাহার উভয়ে সেই দুঃখপোষ্য বালককে সাঙ্গনা করিতে পারিতেছে না! কিছুতি পিতার জন্য কাঁদিলে তাহাকে সাঙ্গনা করা দায়, ক্রন্দন থামিলেও কত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কতবার কুঁপাইয়া উঠে। পাছে বিভূতি কাঁদে সেই জন্য বিরজা অনেক কষ্টে আপন যাতনা দমন করে, অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করে। কিন্তু বিরজা চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে না, তাহার চক্ষু নানে না।

নিরপরাধীর এই সামান্য বিচার হইতে দুই মাস কাটিয়া গেল, শেষ হুকুম হইল যে অধিকাংশকে যাবজ্জীবন বন্দাভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। সমস্ত দিন রাজ সরকারে কার্য করিবে, মাসে ৩৮ টাকা মাত্র পারিশ্রমিক পাইবে। মুর্শিদাবাদ ছাড়িতে পারিবে না, পক্ষান্ত্রে এক দিন মাত্র অবকাশ। তাহাও তিন ঘণ্টার মাত্র!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

—•••—

মেঘেতে বিষলী ।

অধিকাচরণকে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল । একমাস অস্থিভেদি পরিশ্রম করিয়া ৩ টাকা মাত্র বেতন । আর ৩ টাকায় একটী লোকের কি ভরণ পোষণ হয় ? তবে তৎকালে সকল দ্রব্য সুলভ ছিল, তাই একরূপে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইত ।

কিন্তু অধিকাচরণ একা নহেন, এখন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও আর একটী ভরণীয়া আছেন, ইহাদের দশায় কি হইবে ? ইহাদের ভরণ পোষণের চিন্তা করা না করা সমান, কেন না তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই—তাঁহার ইহজীবন এইরূপ নিষাদেই ক'টাটতে হইবে । হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল কোণে পড়িয়া একটী নীচ নিরপরাধীর ইহ জীবন কি ভয়াবহ হইল তাহা দেখ ।

বিরজার চলে কি প্রকারে, বালক বিভূতি খায় কি ? ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার, তুমি যে কি অপূৰ্ণ কৌশলে এই বিশ্ব-সংসার পরিচালিত করিতেছ, তাহা বুঝিয়া উঠে এমন লোক সংসারে নাই—কিন্তু আমরা তোমার কার্য্যের কূটতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বৃথা আৰ্ত্তনাদ করি । কোন প্রকার শিক্ষা নিঃস্বয় তাচ্ছিল্য করিতে নাই, কোন বিষয়ের দ্বারা যে কোন পন্থায় কি উপকার দর্শিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না । বিরজা কাল্যানে পিতৃভবনে তাহার মাতার নিকট মক্কেলত

উপর জরির কাজ করিতে শিক্ষা করে। বিরজা সুন্দর কাপ-
কার্য বড় ভাল বাসিত, সুতরাং তাহা অতি বহু পূরক শিক্ষা
করিয়াছিল, এবং ক্রমশ পরিচালনা দ্বারা তাহার সমধিক উৎ-
কর্ষ লাভ হয়, আজি সেই শিক্ষাই বিরজার ভরণ পোষণের
উপায় হইল। মুসলমানেরা জরির কাজ কিছু পছন্দ করে,
তৎকালে মুর্শিদাবাদে অনেক ধনী মুসলমানের বাস ছিল,
সুতরাং সে সময়ে জরির কাজের বিশেষ আদর ও কাটতি ছিল।

বিরজা মকমলে নাকীপ্রকার সুন্দর সুন্দর হুচর কার্য
করিয়া দিত, আর বিরজা তাহা একজন মহাজনকে নগদ মূল্যে
দেখিয়া আসিত। একশত টাকার দ্রব্য মহাজন পঞ্চাশ টাকায়
কিনিত, তথাপি বিরজার তাহাতে বেশ লাভ থাকিত। মকমল
ও জরি কিনিবার টাকায় বিরজা প্রাণান্তেও হস্তক্ষেপ করিত
না। এইরূপে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। কোন
আর্থিক বিশেষ কষ্ট নাই—কিন্তু মানসিক বড় কষ্ট, যে বিরজা
অধিকাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আজি সেই
বিরজা অধিকাকে পক্ষান্তে একবার মাত্র দেখিতে পায় এ কষ্ট,
এ যাতনা কি অবলার কোমল প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু বিরজা
ভালবাসা অনন্ত অক্ষয়, তাহার আদি নাই—অন্ত নাই, অধি-
কার ইহাই সেই তাপ দহু হৃদয়ের একমাত্র শান্তি। বিরজা!
তোমার ন্যায় বাহ্যিক পণ্ডিত্য কি কোন ছুঃখ আছে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

—*—

মনের ভাল ।

আজি অধিকার আসিবার দিন, অভাগিনী বিরজা কত সাধে কত আত্মদে কত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন অধিকাকে খাওয়াইবে । তাহার হৃদয় অদ্য আত্মদে ক্ষীত হইতেছে, একটা পক্ষ অতীত হইয়াছে, সেই প্রেমপূর্ণ স্নেহময় বদন কমল অবলোকন করিতে পায় নাট, আজি তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে । বিচুতি ভ্রমণ "বাবা আসবে বাবা আসবে" বলিয়া আত্মদে নৃত্য কারণ বিজলীর মুখ ধরিয়া কত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আনন্দে কথা বাহির হইতেছে না । বিজলী তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিরজা হঠাৎ তাহার নিকট আসিয়া তাহার বদন ধরিয়া আবার কত কথা বলিতেছে, বিজলীকে কত ভৎসনা করিতেছে ।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন, পূর্বদিকে শ্রান বদনে নিশানাথ সমুদিত হইতেছেন, সন্ধ্যা সমীরণ মৃদুস্বর বহিয়া যেন প্রকৃতিতে সন্ধ্যা সমাগম সংবাদ পরিচ্ছাদ করিতেছে, কলিকা সন্ধ্যা যেন এই সংবাদে চক্ষু উন্মিলন করিয়া একবার নিশাপতি একবার বা দিননাথের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতে . দুহু সূর্য্যরশ্মি আসিয়া যেন তাহাদ্বিগকে বিদায়

কালিন চুশন করিতেছে। কুসুমচয় উৎসাহে, সোহাগে, আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছে—কুমুদিনী নায়ক ইহা দেখিয়াই কি তুমি এত ম্লান ?

সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমের পর বিরজার সাধের ধন, দরিদ্রের অমূল্য বিভব, সতীর সর্বস্ব, অধিকাচরণ আসিলেন। বিভূতি ভূষণ “বাবা বাবা” বলিয়া নাচিতে নাচিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিল। অধিকাচরণ মেহভরে পুত্রমুখ চুশন করিলেন, সে চুশনে যে কি সুখ তাহা বাহ্যিক সন্তান আছে তিনিই জানেন। অনেককণ পুত্রের নানাবিধ প্রণের ইচ্ছামত উত্তর প্রতি উত্তর দিয়া বলিলেন “বিরজা ভাল আছ ?”

বিরজা । হাঁ ভাল আছি—তোমার শরীর ভাল !

অধিকা । বড় ভাল নয় বিরজা, কএক দিন অবধি সন্ধ্যার সময় যেন একটু অসুখ করে।

বিরজা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে হইল “ভায় আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে স্বামী সেবা করিতে পাইলাম না, যে স্বামিসেবা সতীর সর্বস্ব, সতীর অক্ষয় স্বর্গ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না।” বিরজার সেই ইন্দ্রিবর তুল্য নয়ন যুগল সলিল পূর্ণ হইল। অধিকাচরণ মেহ ভরে বিরজার মুখ চুষণ করিয়া প্রাণ তাঁহাকে ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, অধিকা যে তাহাতে কত অল্পমম প্রকাশ করিলেন তাহা বলা যায় না। কখনো কি যেন শূন্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। প্রেমের অঙ্কুর যেন শুক্ক হইয়াছিল, তাহা সরস হইল !

অধিকা বিরজার পাশে উপবেশন করিয়া বিরজার সেই ক্লান্ত মুখের কর ধারণ করিয়া বলিলেন “দেখ বি— এক

পক্ষের এক একটা দিন যেন আমার এক একটা দীর্ঘ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আমি যে কষ্টে যে যাতনায় সে সময় অতি-বাহিত করি তাহা ঈশ্বর জানেন, বিরজা । এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না, ভাই আর কতকাল এ যম যাতনা ভোগ করিব ? আমি জানি যে যতকাল বাঁচিব তত কাল ভোগ করিতে বাধ্য—ভাই, তবে আমার বাঁচিয়া মুখ কি ? আহা যখন বিহ্বল চাঁদ মুখ খানি মনে পড়ে, তখন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, ঈশ্বরকে বলি “হে ঈশ্বর আমার কপালে কি এত দুঃখ লিখিতে হয়, কিন্তু কই আমার কাতরোক্তি ত তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিতে পারে না। আমার এ অপার দুঃখ ত বুঢ়েনা।”

অশ্রিকার চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু সম্পাত হইতে লাগিল। বিরজা আপন মনে কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে কি ভীষণ শোকোচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা পাষণ্ড হৃদয় মানব কি বুঝিবে ? যিনি নারায়ণী তিনি ব্যতীত আর কাহারও তাহা অনুভব করিবারও ক্ষমতা নাই।

অশ্রিকা আবার বলিলেন “আমি সপ্তাহে একবার করিয়াও যাহাতে তোমাদিগকে দেখিতে পাই সেই জন্য কাজির নিকট আবেদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে—তবে পূর্বে তিনখটা ব্যতীত থাকিতে পাইতাম না, এখন সমস্ত নানি থাকিতে পাইব।”

বিরজার প্রাণ পুলকিত হইল, অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অধিকার দেখিতে পাইবে ইহাই তাহার আশঙ্কা।

অম্বিকা বিভূতি ভূষণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া ও গল্প করিতে লাগিলেন। একরূপ পরাধীন জীবনে প্রাণাধিক প্রিয় কুমারের সহিত ক্রমে কথাবার্তা করিয়া যে কত সুখ তাহা অম্বিকা উপভোগ করিলেন। পতিব্রতা বিরজা তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। আর এক কার্য—একটি সুখের কথা বিজলীকে বলিতে—অম্বিকা রাত্রি বাগন করিবে, প্রাতে আবার সে বিধুবদন দেখিতে পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অত্যাচার।

এই রূপে ভূষণের জীবনে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। এখন বিভূতির বয়ঃক্রম আট বৎসর, বিভূতি পাঠশালায় যায়, পাঠশালায় বালকেরা তাহার পিতার কথা উল্লেখ করিয়া হাস্য পরিহাস করে, বালক ছল ছল নেত্রে দৃষ্টি আনিয়া মাতাকে বলে ও ক্রন্দন করে। এখন বালকের একটু জ্ঞান হইয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় তাহার যে জীবনটী সুখের ছিল, তাহা ক্রমশঃ ভূষণের হইতে স্মরণ হইয়াছে। বাহ্যতে নন্দনের পুত্রঃ সৌরভ বিকীরণ ছিল, তাহাতে সংসার নরকের পুত্র গন্ধ উদ্গম হইবার স্থাপাত হইয়াছে।

অম্বিকা বিভূতি পাঠশালায় গিয়াছে, বিরজার প্রিয়সখী সন্তোষরা স্থানীয়া বিজলী মহাজনের নিকট একটি মণমলের উপর ভূষণের

কাজ করা টুপী বিক্রয় করিতে গিয়াছে। বিরজা গৃহকার্য সমাপনান্তে নিষ্কর্মে বসিয়া আপন স্মৃতি কর্য করিতেছেন, এমন সময়ে কে দ্বারদেশে মূহু আঘাত করিল, বিরজা বিজ্ঞানী আদিয়াছে ভাবিয়া শশব্যস্তে দ্বার উদঘাটন করিয়া দিল, কিন্তু দেখিল—বিজ্ঞানী নয়—অপর ব্যক্তি ।

বিরজার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; বাতীতে কেহ নাট, কিন্তু গৃহ মধ্যে নররূপী রাক্ষস উপস্থিত । আগন্তুক সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বিরজার যেন মহাশয় বাক্যশক্তি বিলোপ হইল ।

আগন্তুক বিজয় !

বিজয় বলিলেন “বিরজা, আমি রাক্ষস নহি, আমাকে ভয় কি? আমি এক কালে তোমার প্রতিবাসী ছিলাম, তোমায় প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে ভাল বাসিতাম, ভাল বাসিতাম নয় বিরজা, এখনও সেটরূপ কি তদগোচ্ছা অধিক ভাল বাসি—কিন্তু তুমি আমাকে দেখিলে অমন ভীত হও কেন?”

বিরজা নিকটর ।

বিজয় । বিরজা আইস ।

বিজয় বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন ।

বিরজা সবেগে হস্তোন্মোচন করিয়া বলিলেন “আপনি আমার গৃহে কেন আসিলেন?”

বিজয় । কেন, বিরজা, হইলে ?

বিরজা । আমার জুত অনিষ্ট করিয়াও কি আপনায় আশা মিটে নাট, রাক্ষসী ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয় নাট?

বিজয় । আমার সকল দোষ ক্ষমা কর ।

বিরজা দেখিল বিজয় মাদক সেবন করিয়াছে, আরও ভীত হইয়া বলিল “আপনি যান, আপনার এখানে আসা অতি অন্যায্য ।

বিজয় । কি করিব বিরজা মন যে বুঝেনা ।

বিরজার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত প্রবাহ হইল, অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় যেন অগ্নি শ্রোত প্রবাহিত হইল, হৃদয় অনন্ত শোকে উচ্ছ্বাসিত হইল, মনে মনে বলিল “হে ভগবান আমার এমনি করিলে যে এ পৃথিবীতে আমার সহায় কেহই নাট।—এত কষ্টে, সংসারের সকল সুখাধার স্বামীর দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত প্রায় হইয়া অতি ক্রেশে বিনাতিপাত করিতেছি, দীননাথ, তাহাতেও কি বাদ সাধিতে হয়, প্রভো ! এ অধিনীকে কি আরও ক্রেশ দিতে তোমার ইচ্ছা আছে ?”

বিজয় । বিরজা কণা কণা ।

বিরজা দেখিল ভয় করায় কোন ফল নাট বরং অনিষ্ট আছে, সুতরাং, হৃদয়ে বিগুণ সাহস করিয়া বলিল “আপনি এখনি যান ।”

বিজয় । ও চাঁদ মুখ দেখিয়া কি বাটতে পারি—বিরজা, সে ভিখারীটাকে বিদ্রুত হও একবার মগের প্রাণ কর ।

বিরজার হৃদয় যেন জলিয়া উঠিল, সঙ্কোপে বলিলেন “সাবধান হইয়া কণা কণিবেন, আপনি এখনি এখান হইতে যান, নতুবা আমি চীৎকার করিব । ”

বিজয় । বিরজা আমার একবার আলিঙ্গন দাও নতুবা আমি বাটব না । আমার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনার জন্য যদি আমার—প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, আমি অম্লান বদনে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি ।

বিরজা সম্মল চক্ষে বলিল “অনাথিনী দরিদ্রার উপর এত অত্যাচার করিবেন না, ঈশ্বর কখনই এত সহিবেন না ।”

বিজয় উচ্চহাস্য সহকারে কহিল “বিরজা, ঈশ্বর আবার কে ?”

বিরজা । পরে জানিতে পারিবেন, তাঁহার চক্ষে ধূলা দেওয়া যায় না, তাঁহার বিচারে পক্ষপাত নাই ।

বিজয় । ও সকল বাজে কথা যাক, এখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তোমার দারিদ্র্য শুচাও, আমি এখনি তোমাকে রাজ্য-রানী করিতে পারি ।

বিরজা সক্রোধে কহিলেন “সন্নতান, তুমি আমার অধ-লোভ দেখাইতেছ, এখনি দূর হও ।”

বিজয় ‘হইতেছি’ বলিয়া বিরজাকে আক্রমণ করিল । বিরজা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইতে পারিল না, উভয়ে অনেক ক্ষণ পরস্পরে বল প্রকাশ করিল, কিন্তু ক্রমশঃ বিরজার বল হ্রাস হইতে লাগিল । বিরজার শ্বশুর কেহ নাই—বাটা পল্লী পার্শ্বে, সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই, চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পায় কি না সন্দেহ, বিজয় উন্মত্ত, বিরজা নিরুপায়, তাহার অন্তর কানিয়া উঠিল, বক্ষ সবেগে হ্রস্ব হ্রস্ব করিতে লাগিল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল । মনে মনে বলিল “দয়াময় ! ঈশ্বর, অনাথিনীর তোমা বই আমার সহায় নাই, বিপদভঞ্জন এ বিপদেয় সমস্ত উদ্ধার কর পদব ।”

বিজয় আবার সবেগে বিরজাকে টানিল, বিরজা ভূমিতে

পড়িয়া গেলেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পামর তাহার বদন চাপিয়া ধরিয়া বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, বুঝি বা সতীর সর্বনাশ হয়, বিরজা সবেগে সবলে বিজয়কে পদাঘাত করিতেছে, কত কাকূতি মিনতি করিতেছে, সতীত্ব নাশ ভয়ে উভয় চক্ষু দিয়া শত খারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, তথাপি তাহার ক্রক্ষেপ নাই, সে আপন চেষ্টায় রত। এমনত সময়ে সহসা দ্রুত বেগে সেই গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজার হৃদয় আনন্দে ক্ষীত হইল, তিনি তখনি নুচ্ছিতা হইলেন।

আগন্তুক বিজয়কে টানিয়া আনিয়া প্রহার করিতে লাগিল, বিজয় তাহার নিকট ক্ষীণ প্রাণী, স্তব্ধরাসে সে দারুণ প্রহারে মৃত প্রায় হইয়া উঠিল। তাহাকে, নিদারুণ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে সাধ্য মত দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তখনও বিরজার মোহ ভঙ্গ হয় নাই, আগন্তুক বিরজার চখে মুখে জল দিলেন, থাকিয়া থাকিয়া সেই বদন কমল চূষন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিরজার জ্ঞান হইল, বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া সভয়ে ডাকিল “নাথ, অধিক!”

অধিক। কেন বিরজা।

অধিক। আবার বিরজার মুখ চূষন করিলেন। বিরজা দেখিলেন, অধিকার চক্ষু রক্তবর্ণ, বদন মণ্ডল রক্তাভ, বুঝিলেন যে ভয়ানক রাগ বশতই এরূপ হইয়াছে। বিরজা স্বামীর উবসে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া তাহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। বিরজা যেন সূর্য্যমুখ উপভোগ করিল, তাহার হৃদয় আনন্দে

উছলিত হইতে লাগিল । বিরজা ভাবিল এত সুখ
আর কোথাও নাই, ইহাই সংসারের অনন্ত সুখ !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

বাজে কথা ।

বিরজার একটি দিন গেল, কিন্তু হতভাগ্য অম্বিকাচরণের
বুঝি সকল দিন গেল । বিজয়ের অম্বিকাচরণের উপর
ঘোরতর আতঙ্কোষ জন্মিল, যে ক্রোধ ছিল তাহা দ্বিগুণিত
হইল । নানা উপায়ে তাহাকে রাজধারে দণ্ডিত করিতে লাগিল ।
কখন বেত্রাঘাত, কখন অল্প দিন কারাবাস, এই রূপ শাস্তি
অম্বিকার নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে হইয়া উঠিল । অম্বিকা
দেখিলেন তিনি নিরুপায়, এ সংসার—এরাণ্য আর তাঁহার
স্বপ্নের স্থান নয়, এ পাপ পৃথিবী পরিভাগ ভিন্ন আর তাঁহার
শাস্তি নাই । এরূপ অত্যাচারে ওয়াসিংটন, ওয়েলিংটন,
বোনাপার্টি প্রভৃতি বীরগণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, তায় অম্বিকা
কেন ছাড় !

অম্বিকার দিনে দিনে সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইতে লাগিল ।
তিনি যেন ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন ।
বিভূতির সেই প্রেমপূর্ণ বদন তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে
অপসারিত হইতে লাগিল । বিরজার ভালবাসা, সেই অপরি-
ণীম অপরিমেয় স্বর্গীয় ভালবাসা, আর তাঁহার বিদগ্ধ হৃদয়ে
প্রীতি বিধানের সক্ষম হইল না !

যে অম্বিকা বিরজার বদন নিরীক্ষণ করিতে উদ্যত হইতেন,

বাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া অবনীতে স্বর্ণস্বপ্ন অমৃতভব করিতেন, আঞ্জি সেই অম্বিকা আর সে মুখ না দেখিয়া ব্যথিত হন না। দেখি ভাল, না দেখি ক্ষতি নাই, এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে; বিরজার যে স্বপ্নটুকু এ সংসারের আশ্রয়তরু স্বরূপ ছিল, তাহাও বুদ্ধি নির্মূল হইল।

সম্মুখে নারী সদয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নারী হইলে অপিকার এরূপ ভাবাস্তর হইত কি না বলিতে পারি না। বিরজা যে সর্বভাগিনী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সংসারের সকল সুখে অলাঞ্জলি দিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়াছে, সংসারের মোহকর চাটুবাক্যে জর্জরিত করে নাই, আঞ্জি তাহারই পুঙ্কর দিতে বুদ্ধি অপিকার এই ভাবাস্তর উপস্থিত! কিন্তু বিরজার প্রেম পূর্ববৎ, তাহা অটুট, অক্ষুণ্ণ। সে অম্বিকা কিসে সংসার চলিবে, কিসে বিভূতি মানুষ হইবে, লেখা পড়া শিখিবে, এইরূপ কত প্রকার চিন্তা করিতেন, আঞ্জি আবার সেই অম্বিকা বিভূতি আহা পাইল কি না তাহা ভাবেন না, যদি এক দিন তাহার মাতা পুত্রে আহার না পায় তাহা হইলেও হয়ত বিরস চিত্ত বা দুঃখিত হন না। মনুষ্য তোমার বুকা ভার! বিশেষতঃ পুরুষ তোমার হৃদয়ের বিকৃতি জন্মিলে তুমি না করিতে পার এমন কাজ নাই! কিন্তু কেন এরূপ ভাবাস্তর হয় তাহা কি কেহ বলিতে পারেন?

বিরজা বা বিজলীর কথা ছাড়িয়া দি, বালক বিভূতিভূষণও তাহার পিতার এই আকস্মিক ভাবাস্তরের বিষয় বুলিয়াছে, সেও মাতার নিকট কান্দে—বলে “মা, বাবা আর আমার ভাল বাসে না, আমার চুমো থায় না।”

বিরজা নানা কথায় তাহাকে ভুলায়, তাহার চর
পাছে বালক নিরুদ্যম হয়, পাছে তাহার কোমল হৃদয়
ভাঙ্গিয়া যায় !

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

দুর্গোৎসব ।

বন্দে দুর্গোৎসব, আজি মহামায়ার পূজা উপলক্ষে অধিকা
চারি দিবস অবকাশ পাষ্টয়াছেন, গত বারে বলিয়া গিয়াছিলেন
যে, এই চারি দিবস বাটীতে থাকিবে, যষ্টীর দিন আসিবেন ।

বিরজার আনন্দের সীমা নাই—চারি দিন স্বামীকে দেখিবে,
হৃদয় ভরিয়া দেখিবে, সে আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে ?
সহর লোকে লোকারণ্য, সকল লোকই যেন আনন্দে উৎ-
সাহিত, সকলেই প্রফুল্ল । মহামায়ার সমাগমে বাস্তব, এই
সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা বলিবার
প্রয়োজন নাই ।

সন্ধ্যা হইল, বিরজা ঘরবার করিতেছে, অধিকা এই আসেন ।
‘বিভূতি মাতৃদত্ত পোষাকটা পরিয়া পিতৃ আগমন প্রতীক্ষা করি-
তেছে । পিতা এখন আসেন, বালক তাহাকে আপন পোষাক
দেখাইবে, ছুতা দেখাইবে, তাঁহার সহিত পর দিবস কোথায়
পূজা দেখিতে যাইবে তাহার পরামর্শ করিবে । এইরূপ কতট
ভাবিতেছে ।

ক্রমে সন্ধ্যা উদ্ভীর্ণ, হটল, অধিবাসের বাদ্যবোল হটল,
অধিহাস শেষ, হটল, কিছু অধিকা আনিলেন না । বিরজা উৎ-
কর্ণ হইয়া আছে, একটা সামান্য শব্দ হইলে—মনে করিতেছে

ঐশ্বরী অধিকা আসিতেছেন, তুই তিন বার শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহই আসিল না ।

বিজলী বলিল “আজ শেষ দিন, তাতে অধিক আজকর্ষ আছে, তাই এখনও আসিতেছেন না, রাত্রে আসিবেন ।” বিরজাও তাহাই বিশ্বাস করিল । বিভূতিকে আহ্বার করিতে বলিল । “বালক বলিল “আমি বাবার সঙ্গে খাব ।” বিজলী অনেক প্রকারে তাহাকে ভুলাইয়া আহ্বার করাইয়া শয়ন করাইল । বালক পিতার কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাগত হইল ।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রগাঢ় হইল, ক্রমে অশ্বিকার আসিবার আশা গেল । এখনও বিরজাও বিজলী জাগরীত । বিজলী বিরজাকে আহ্বার করাঠিতে অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, সুতরাং বিজলীরও আহ্বার হইল না । ঠিক আজি নুতন নয়, প্রায় ছয় মাস হইতে মধ্যে মধ্যে একরূপ চেষ্টা আসিতেছে । কাহারও নিদ্রা নাই—বিরজা অবিরত কাঁদিতেছে । বিজলী কত প্রকার শাস্ত্রনা বাক্য প্রয়োগ করিল, কিন্তু প্রকৃত যাতনার শাস্ত্রনা কাছে কি ? সুতরাং বিরজার ছন্দর মানিল না, তাহার যাতনার অবসান হইল না ।

রাত্রি প্রভাত হইল, গগুমী আসিল, বিভূতি নিদ্রা ভঞ্জে ভ্রান্ত ভাবে উঠিয়া “বাবা বাবা” বলিয়া ডাকিল । কেহ কোন উত্তর দিল না । বালক নিষ্ঠুর হইল, তাহার বিষম্ভাব দেখিয়া বিরজার চক্ষে জল আসিল, বিজলীও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না ; কিন্তু পাছে তাহার চক্ষে জল দেখিয়া বিভূতী আরও কাঁদে এই আশঙ্কায় সে শয্যা চাইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গেল ।

ক্রমে গগুমীও গেল. অষ্টমী আসিল, তাহাও শেষ হইল ।

আজি নবমী, বেলা অপরাহ্ন—এমত সময়ে অধিকাচরণ টলিতে টলিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিরজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিছু সত্য তাহা সহ্য করিলেন, বিরক্ত হইলেন না, সাফ্লাদে স্বামীর নিকটে গেলেন।

বিরজাকে দেখিয়া অধিকা মৃদু হাসিয়া বলিল “আমি এশেছি।”

বিরজা। তুমি না আসিবে ত কে আসিবে—এসংসারে আর আমার কে আছে ?

বিভূতি “বাবা বাবা” বলিয়া নিকটে আসিল।

বালক ভাবিল পিতা কত সোহাগ করিবেন, কিন্তু অধিক প্রীতি উত্তরে বিরক্তি সহকারে বলিলেন “কি ?”

বালক স্তম্ভিত হইল, কি উত্তর দিবেস্থির করিতে না পারিয়া বলিল “আমি—আ—”

অধিকা সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন “ব্যস্ত করিস্নে।”
বালক দুর্ভাগ ও বিসাদিত হইয়া সরিয়া গেল।

অধিকা। বিরজা দশটা টাকা দিতে পার ?

বিরজা শব্দবস্তে টাকা কয়টী আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল,
অধিকা টাকা কয়টী লইয়া বলিলেন “আমি কেন টাকা লই-
তেছি প্রিজ্ঞান্য করিলে না ?”

বিরজা। আবশ্যক আছে তাই লটেতেছ, তা আবার
প্রিজ্ঞাসা করিয়া কি, বতঙ্গা আমার আছে ততক্ষণ দিব। যখন
না থাকিলে তুমি দিবে।

অধিকা। আমি ? না না তা দিব না, কোথায় পাব ?
আমার টাকার এখন বড় দরকার। প্রায়ই বন্ধুবান্ধব নিষে

আমোদ কর্ত্তে হয়, আর না করে করি কি ? সেই অন্য দেখতে পাও না যে তোমার কাছ থেকে প্রায়ই টাকা নিয়ে যাই ।

বিরজা । ষষ্টির দিন আসুব বলে ছিলে এলে না কেন ? তোমায় না দেখলে যে বড় কষ্ট হয়, প্রাণ যে ফেটে যায় ।

বিরজা কাঁদিল ।

অম্বিকা । এইত এসেছি, কিন্তু এখন চললাম ।

বিরজা । এখনি !

• অম্বিকা । হ্যাঁ এখনি ।

বিরজা আকুল ভাবে কহিলেন “আজ থাক, তোমার পায়ে পড়ি আজ থাক ।”

অম্বিকা জুড়টি করিয়াকহিলেন “তোমারটাকা কটা নিয়েছি বলে যেতে দিতে কষ্ট হচ্ছে না কি ?”

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল “তবে জল খেয়ে যাও ।”

অম্বিকা “না” বলিয়া প্রস্থান করিলেন ।

বিরজা ভগ্নোৎসাহ ও মম্মপীড়িত হইয়া আপন শয্যায় যাইয়া কাঁদিতে লাগিল । বালক বিভূতী স্তম্ভিত ও ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বিজলীকে মৃদুস্বরে কহিল “বাবা কোথা গেল বড় মা ।” বিজলী সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সম্মুখ চক্ষু সে কথার উত্তর দিতে বিরত হইল নী । বালক তাহা বুঝিল কি ? বুঝিল বই কি, বিভূতী কাঁদিয়া আকুল হইল ।

বিংশতি পরিচ্ছেদ ।

—:—

দুঃখের উপর দুঃখ ।

দূর্গাপূজা ছয় মাস হইল অতীত হইয়াছে । অম্বিকার এখন আর হিতাহিত জ্ঞান নাই, টাকা পাইলেই লইয়া যায়, এবং টাকা চাহিবামাত্র বিরজাও দেয় । স্বামীর নিকট গোপন করিতে এত শিখিয়াও পারিল না !

বিরজা এখন দিবা রাত্র পরিশ্রম করে, হৃদ্ধ আপনার ভরণ-পোষণ ভার নহে, অম্বিকার আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার অভাব মোচন করিতে হয় । এই দুর্নিবার পেয়ণে কখন কখন বিরজাকে উপবাসে দিন কাটাতে হয় । এই দারুণ হুঁশিয়া ও ক্রেশে আমাদের চিরদুঃখিনী বিরজার দিন কাটিতেছে, ইহাও বিরজার স্বামীর প্রতি অনাস্তা নাই, বরং তাঁহার প্রতি আরও ভাল বাসা বাড়িয়াছে,—সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইয়াছে ।

সন্ধ্যাকাল, বিরজা বিভূতিকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে এবং বিরজা এক মনে একটি দাম্ভ্য জরির কার্য করিতেছে, এমন সময়ে গৃহ মধ্যে অম্বিকার প্রবেশ করিলেন । বিরজা ব্যস্ত ভাবে কার্য ফেলিয়া স্বামীকে বসিতে আগমন দিল । এ অম্বিকা আর যেন আমাদের সে অম্বিকা নয়, সেই দেহে যেন অন্য হৃদয়ের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।

সে শ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, মুখ ভাবের সেই অপূর্ণ সারল্য নাই, সকলেরই যেন ঘোর পরিবর্তন ঘটয়াছে

অম্বিকার হৃদয় হইতে কি ভালবাসা একেবারে তিরোহিত হই-
রাছে? না তাহা নয়—অত্যাচার যাতনায় তাহার মানসিক
বিকৃতি জন্মিয়াছে, হৃদয়ের ভালবাসা অবস্থান্তরে অবস্থান্তর
ধারণ করিয়াছে, অম্বিকা দেবতা হইতে একেবারে পশুভাবা-
পন্ন হইয়াছেন।

অম্বিকা বলিলেন “বিরজা, আমি কেন আসিয়াছি
বল দেখি?”

বিরজা। বিভূতিকে দেখিতে।

অম্বিকা। বিভূতিকে দেখিয়া কি আমার স্নর্গলাভ হইবে?

বিরজা নিরুত্তর।

অম্বিকা। আমায় কিছু টাকা দিতে পার?

বিরজা নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল “টাকা ত নাই।”

অম্বিকা। নাই!

বিরজা। একটা তামার পয়সা নাই।

অম্বিকা। তবে কি কাপ্ত কর?

বিরজার বড় দুঃখ হইল, দিবারাত্র পরিশ্রম, ইহাতেও
অভিযোগ। চক্ষে জল আসিল, সে জল বহু কষ্টে দমন করিয়া
ভাবিল কাহার উপর বা অভিমান।

অম্বিকা বিরজার হস্তস্থিত জামাটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল
“এ জামাটা বিক্রি করনাই কেন?”

বিরজা। কাল বিক্রি হবে।

অম্বিকা। আজ আমার আবশ্যক কাল হইবে কি?

বিরজা। কাজত এখনও শেষ হয় নাই।

অম্বিকা। দেখি।

বিরজা জামাটি স্বামীর হস্তে দিল।

অধিকা। আচ্ছা আমি বেচুব, তোমায় কষ্ট করতে হবেনা।

বিরজা। ওবে ফরমাশি জামা।

অধিকা। তাকে আর একটা তৈয়ার করে দিও।

বিরজা আকুলভাবে সজলনেয়ে কঠিল “আমি কোথায় পাব, আমার পুঁজির কয়টা টাকাও যে ঐতে আছে। আমার পরিশ্রমের টাকা ভূমি নাও, পুঁজি গেলে আমরা যে না খেতে পেরে মারা যাব।”

অধিকা তাহার কোন উত্তর না দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন, বিরজার সম্মুখে যেন বজ্রপাত হইল, এতদিন তাহার কিছুতেই হুঃ হুঃ হয় নাট, আজি তাহার মর্যাদাতিক হুঃ হুঃ হইল, কি হইবে কি করিয়া বিভূতিকে বাঁচাইবে, এই চিন্তাই তাহার নিদাক্ষণ হইল।

বিরজা নিকটে বসিয়া সমস্তই দেখিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না।

পর দিবস তটতে সামান্য তৈয়্যস পূজা বাহা কিছু ছিল। তাহাই বিক্রয় করিয়া আপনারা একসম্মত। অল্পমাত্র আহার করিয়া বিভূতির অন্য ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কাজ কর্ম বন্ধ হইল। লোকে বিশ্বাস করিয়া আর কেহ কাজ দিলনা, সকলেই আমিন চায়, কিন্তু অভাগিনী বিরজা আর আমিন কে?

আর কি, বাহা কিছুছিল তাহাও শেষ হইল, আর দিন চালানা, কালি কি হইবে তাহার স্থির নাই। দোকানদারেরা যে সামান্য ধার দিত তাহাও বন্ধ করিল, ঘরে এখন কিছু নাই

যাহাতে সে দিন চলে। বিজলী ভিক্ষা করিয়া দুইটি পয়সা আনিয়াছিল তাহাতেই বিভূতি সে দিন উপবাসে রহিল না। আবার রাক্ষসী দিবা আগিল, সর্বগস্তাপহারিণী নিশা ধীরে ধীরে আপন মোহকর আবরণী উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নিকট নিদ্রিষ্ট সময়ের জন্য বিদায় লইলেন। আবার বিরজা ও বিজলীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, কি হইবে, কি করিয়া দিন কাটিবে : বালক প্রাতে উঠিয়া “মা ক্ষিধে পেয়েছে” বলিয়া কাদিতে আরম্ভ করে, সে কি জানে যে আহার এত হৃৎপা ব্যস্ত। সে কি জানে যে তাহার পিতা এত পশুভাবাপন্ন হইয়াছেন ?

বিরজার চক্ষের জল আর শুক হয় না। বিজলী আবার ভিক্ষার বাহির হইল, কিন্তু ভিক্ষা কবে কোথায় ? ভ্রীলোক না দেখিলে চাহিতে পারে না। ভিক্ষা করা কি বিরজা বা বিজলীর কর্ম, কিন্তু বিধাতা তুমি তাহাদের ললাটে তাহাও লিখিয়াছ !

বেলা প্রায় দুই প্রহর, এখনও দুধের ছেলে জল খায় নাই—এমত সময়ে গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজা চিনির্ল যে তাহার পিতা গোপালচন্দ্র ; শশব্যস্তে তাহাকে বসিতে আসন দিল।

গোপালচন্দ্র মূহু হাসিয়া বলিলেন “কেমন বিরজা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছে ত ?” ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইল ! এই তোমায় অস্থিকা ভালবাসে, এট ভালবাসার অন্য তুমি পাগল, আমি সকল কথাই বিজলীর নিকট এই মাত্র শুনিয়াছি।”

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিলনা, কেবল অথোরে কাদিতে লাগিল।

গোপাল । এখনও যদি চেতনা হইয়া থাকে তবে আমার
সহিত দেশে চল, আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার ।

বিরজা । আমি কি করিয়া যাই ?

গোপাল । কেন ?

বিরজা । তাঁহাকে ফেলিয়া ?

গোপাল । সে হতভাগার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে আমি
তোমার কোন উপকার করিব না ।

বিরজা । আমরা না করেন, আমার ছেলের করুন,
বাচা আমার এখনও জল খায় নাই ।

বিরজা কাঁদিতে লাগিল । চক্ষের জলে বন্ধ ভাগিয়া
যাইতে লাগিল ।

গোপাল । না বিরজা, আমি ওসকল ভাল বুঝি না
তুমি অধিকাকে ছাড়িবে ?

বিরজা । আমি তাহা পারিব না ।

গোপাল । এই কষ্ট ভোগ করিবে ?

বিরজা । এই কষ্টই আমার স্বর্গ ।

গোপাল । তবে স্বর্গ স্থল ভোগ কর ।

বিরজা স্নানেনে বলিল "বাবা বিভূতির উপায় করুন ।"

গোপাল । তোমার ছেলে আমার কেহ নয় ।

গোপাল এই বলিয়া রাগভরে চলিয়া গেলেন । বিরজা
নন্দনের মুখচুমন করিয়া স্বপ্নে কাঁদিতে লাগিলেন ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

শুগের সূত্র ।

বিজলী চিরকাল বুদ্ধিমতী, গোপালের একটা কথাতেই বুকিয়াছিল যে ইহার দ্বারা কোন উপকার সম্ভববে না । বিজলী তখন পর্য্যন্ত একটা পরমাণু ভিক্ষা পায় নাই, সুতরাং তাঁহা সহিত অধিক কথা কওয়া সময় নষ্ট না করিয়া, সজল চক্ষে ভিক্ষা প্রাপ্তি আশায় ছুটিল, গত দিবস হইতে তাহার আগার হয় নাই, তাহা মনেও নাই, বিহুতির আহারোপযোগী কিছু পাইলেই হয় ।

অনেক বেলা হইয়াছে, দুইপ্রহর অতীত হইয়া, দুই দণ্ড হইয়াছে, বাছা না জানি কি করিতেছে, কিন্তু তখনও ভিক্ষা পায় নাই, রাস্তায় একটা স্ত্রীলোক নাই, হিন্দু অতি অল্প, মুসলমানই অধিক, ভিক্ষা চাহিলে তাহার পরিহাস বিক্রম করে ; অথচ ভিক্ষা চাই-ই ! দুই একটা ভদ্রলোকের, নিকট ভিক্ষা চাই চাই করিয়া লজ্জায় চাহিতে পারিল না । এবার ভদ্রভোক দেখিলেই চাহিবে, ইহাই স্থির করিল ।

বিজলী যাইতে যাইতে একটা সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে গাইল, দেখিলু বাটিয়া বাঙ্গালির ।—বাটির সম্মুখ ভাগে প্রহরী ও বহুলোকের জনতা দেখিয়া, কোন বড়লোক যে ইহার অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না । অনেক লোক জন দেখিয়া বিজলী প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, আবার ভাবিল আবার লজ্জার জন্য

বাহা আমার মারা যাঠবে, আগার কি ভাবিয়া নিকটবর্তী
টী বৃক্ষ তলে উপবেশন করিল ।

বিজলীর দুই গু হইতে তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে,
এন সময়ে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল “ওগো, তুমি
ক'রা ?”

বিজলী । কেন মা ।

স্ত্রীলোক । রাণী মা তোমায় ডাক্‌চেন ।

বিজলী । রাণী মা কে মা ?

স্ত্রীলোক । কন্দনগরের মহারাণী ।

বিজলী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল । বলিল “তিনি
ক'বে এলেন ?”

স্ত্রীলোক । তীর্থ কর্ত্তে গিয়েছিলেন কাল এসেছেন ।

বিজলী অরে কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ
করিল, দাণী তাহাকে মহারাণীর নিকট লইয়া গেল ।

মহারাণী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন “বিজলী তোমার
এ দশা কেন ?”

বিজলী ক্ষণেক কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল
তাঁহার বদন প্রান্ত চাহিয়া অনিমেষ লোচনে কাঁদিতে লাগিল ।

মহারাণী । কাঁদিও না, তোমার কন্দন দেখিয়া আমার
বড় ক্রোধ হইতেছে ।

তখন বিজলী মহারাণীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সরোদনে
সকল ঘটনা বিবৃত করিল ।

মহারাণী বদনাক্ষলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন “আমায়
বিভূতির এমন দশা হইয়াছে, আমরা কি জানি যেনবাব

অধিকারকে গেষ্টার করিয়াছিলেন, আমরা মনে করিলাম তোমরা হয়ত আনিলে না ।”

মহারানী আর কোন কথা কহিলেন না, বিরজার অকৃত্রিম শ্রমী ভক্তি দেখিয়া, তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা দ্বিগুণিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা ও দাস দাসী পাঠাইয়া বিরজাকে আনিতে পাঠাইলেন। বিজলীও তাহাদের সঙ্গে একখানি খতঙ্গ শিবিকা করিয়া গেল। তাহার সহিত প্রচুর আশ্রয় সামগ্রী ও বসন ভূষণ প্রভৃতি প্রেরিত হইল। যথা সময়ে বিরজা ও বিভূতি আদিয়া মহারানীর চরণে প্রণাম করিল। মহারানী স্নেহে বিভূতিকে কোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অধিকার ন্যায্য বিচার যথার্থে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন বলিয়া বিরজাকে সান্তনা করিলেন। বিরজা তাঁহার মধুর বাক্যে অনেক আশ্রিত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—*—

দম্পতি-সুখ ।

‘পাঠক। গোপালের বিবাহের কথা আপনি অবগত আছেন, কিন্তু বুদ্ধ বয়সে কি সুখে বিবাহ করিয়াছে ও কি সুখ পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলা ভাল হইতেছে না।

গোপাল চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের জীব চরিত্র বর্ণিত করিতে

গেলে, অনেক কথা পাঠককে না বলাই কর্তব্য, কিন্তু না বলিলেও সে চরিত্রের প্রফুটন হয় না, সুতরাং পাঠক মার্জনা করিবেন, অশ্লীলতা দোষে দূষিত বলিয়া আমরাগকে তিরস্কার করিবেন না ।

আজ কাল বেশ্যার কথা উত্থাপন করিলে অনেকে “অশ্লীলতা অশ্লীলতা” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, কিন্তু বেশ্য। চরিত্র কি চিত্রিত করিয়া ফল নাই?—তাই বলি অশ্লীলতা অন্য পদার্থ। পাঠক, সেই কথাটী স্মরণ করিয়া আমাদের মোক্ষদা সুন্দরীকে দেখিবেন । চরিত্র দেখাটতে যদ্যপি অশ্লীলতার ছায়া আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন ।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গোপালচন্দ্র শ্রীষ কাণ্ড হইতে অবসর পাইয়া গৃহে আসিলেন । সখীবনা স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী আপন রূপালোকে গৃহ আলোকিত করিয়া রতিয়াছে । বুকের সুন্দরী সখীবনা স্ত্রী যে কি আদরের সামগ্রী, কি আদর ঘরের আলোক, কি সাত রাজার ধন মাণিক, তাহা আর বিচক্ষণ পাঠককে বলিতে হইবে না । বুকের আসিয়া ক্ষণেক হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া গেল ।

মোক্ষদা সেই গোলাপী অধরে মুহূ হাসিয়া বলিল
“আ-মরণ হাঁ করে দেখছ কি ?”

গোপাল । ভোমায় দেখছি ।

মোক্ষদা । আনায় দেখে কি রাজা হবে? হাঠ পা দেওগে না ।

গোপাল হতুপদ ঈক্ষালন করিয়া আসিয়া বলিলেন ‘অল খাবার দাও ।’

মোক্ষদা। ঐ আছে গাওনা।

গোপাল। তুমি দিতে পার না?

মোক্ষদা। আমার অত রস গড়ায় নি?

গোপাল। দেখ তুমি আমায় যত্ন কবে গাবার কি পানটী দিলে আমার কত আশ্রয় হয়, তা দিয়ে কি তুমি আমার সুখী করিতে পার না?

মোক্ষদা। পারব না কেন, সব পারি, তোমায় পারিনে।

গোপাল। কেন পারনা মোক্ষদা, আমি কি করেছি?

মোক্ষদা। করবে আবার কি।

গোপাল। তবে কেন পার না?

মোক্ষদা। অমাব ঠাণ্ডে, আমার খুশী।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন
“বটে!”

মোক্ষদা। বটে নয়ত কি? বিয়ে করতে গেছে কেন?

গোপাল। তোমার কিসের অভাব, বিয়ে করে তোমায়
কি অসুখী করেছে!

মোক্ষদা। তোমার মত যার স্বামী তার আবার অসুখের
বাকি কি?

গোপাল। কেন?

মোক্ষদা মুখ নাড়িয়া বলিল “কেন তা আমি জানিনে।”

গোপাল। তা বলতেই হবে।

মোক্ষদা। আশোড়ায় মুখ, কেবল গিলতেই জান। এই
সামান্য কথাটী বুঝতে পারলে না? তুমি না জান কখন
কইতে, না জান ভাববসতে, না জান সোধাগ করতে, না

জান মান ভাঙ্গাতে, তোমার আবার কি গুণ আছে, যে স্ত্রী
বড়াদড়ি ছিড়ে ঐ তোবড়া গালের দাগী হবে? স্ত্রীর ভাল-
বাসা স্বামী নিতে না জানলে কি স্ত্রী দিতে জানে, যে
নৌকার মাঝি ভাল, তার সব ভাল, আর যার তোমার মত
হস্তি মুখ মাঝি, তার মাঝি, দরিয়ায় ভরা ডুবি।

গোপাল। তা আমি জানিনা বটে, আচ্ছা মোক্ষদা তবে
তুমি আমার ওসব শেখাও না কেন?

মোক্ষদা। আ মরণ, আমি শেখাব, বাহাতুবে হয়ে
মরতে যাচ্ছি শিখতে পারনি, এখন শিখবে। বলতে লজ্জা
করে না? আমি আবার শেখাব, ভেমন লোক পেলে আমরা
কত শিখ্তাম।

গোপাল। লোক পাওনা না কি?

মোক্ষদা। মরণ যত মরতেই জানেন, আমি তা বললাম,
না, বললাম তুমি যদি লোকের মত লোক হতে তা হলে এত
দিন কত শিখ্তাম। যুঁতী আর ছেলে রোজ নুতন নুতন
শিখতে চায়।

গোপাল। তোমার বড় রাগ, আমায় বড় গাল দাও।

মোক্ষদা। মাঝে দি,—হাড় জলে বলে দি। নইলে কি
সাধ।

গোপাল। লোকে তোমার কত নিন্দে করে।

মোক্ষদা। তোমায় গাল দি বলে?

গোপাল। ইয়া।

মোক্ষদা। তোমার মত বুড়রাই করে,—ছোড়ারা হাসে!

গোপাল। সে দিন তুমি যে করেছিলে?

মোক্ষদা । সাধে করে ছিলাম, উনি ওঁর মেয়েকে আন-
বেন বাড়িতে রাখবেন, আর আমি ওঁর পুজো করবো ।
আমরণ—

“সতিনের ঘা সহিতে পারি ।

সতিন্ কঁটা সহিতে নারি ॥”

গোপাল । আমি কথার কথা বলেছিলাম বইত নয় ।

মোক্ষদা বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, “কি আমার
কথার কথা, কি আমার কথা কহিয়ে রাগক পঞ্চানন্দে ।”

গোপাল । ভূমি যা কর তা কর কিন্তু বিজয় বাবুর সঙ্গে
কথা কয়ওনা ।

মোক্ষদা । কেন কব না, ইস্ কি আমার শাস্তে এলেন,
আমার খুশী কবো । চিরকাল কথা কয়ে এলাম, এখন কথা
কব না, সে ভদ্র লোকের ছেলে কি মনে করবে, তোমার
এত যদি সন্দেহ তবে গোড়ায় বারণ করতে পারনি । গোড়া
কেটে আগায় ছল ঢালা আমার চুচকের বিষ ।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । মোক্ষদা
রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে স্থানান্তরে গমন করিল

—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

প্রতিবিধান ।

মোকদ্দা স্থানান্তরে গমন করিলে গোপালচন্দ্র অনেক কণ নিমন্তক ভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে—বিবাহ করিয়া কি মহাপাপ করিয়াছি, ছিলাম স্বাধীন, হইলাম পরাধীন, কোথাও যাইয়া তৃপ্তি নাই ; না দেখিলেও থাকিতে পারি না,—দেখিয়াও সুখ পাই না। আমি উঠাকে যেকোন ভালবাসি, মোকদ্দা যদি ততাব একচতুর্থাংশ আমায় ভালবাসিত, তাহা হইলে আমায় সুখ ঘটিত না । কিন্তু সকলই তাহার বিপরীত, মোকদ্দা আমায় চুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মোকদ্দা আমায় কি বলিল বুঝিলাম না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে পাছে আরও অসংগত মনে করে বলিয়া কিছু বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলাম না । কে জানে রমণী তোমার কৈমন মন, আর পেড়া পুরুষ তেমন মন ও ধনা, যে এত লাক্ষিত হইয়াও ভালবাসিতে চাও । অনেকে বলে আমি স্ত্রী-শাসন করিতে জানি না, সেই জন্য স্ত্রী আমার অবাধ্য—কিরাপে স্ত্রী-শাসন করিব ? এতারা ? তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে ! লোকে আমার মত গোবৎসা স্ত্রীর হাতে পড়ে, তা হলে বুঝি কৈমন তাহার স্ত্রী-শাসন করে । আমারই কি স্ত্রী ছিল না, সে কত বাধ্য ছিল, আচ্ছ সে আমার—

গোপালের চক্ষে জল আসিল ।

গোপাল আবার কি ভাবিয়া বলিলেন “তাইত মোক্ষদা এত কণ কি করিতেছে, আমি তাহার নিকট যাইব কি, হয়ত মারিতে আসিবে, আগে আসুক, আমি তাহার শয় ধরিয়া বলিব তুমি আমার ভালবাস, ভালবাসা ব্যতীত কি মুখ আছে, স্ত্রী হাতের পুতুল না হইলে কি তৃপ্তি আছে? আমি যাই, রাগ করে করিবে। মোক্ষদার চরিত্রে আমি কখন সন্দেহ করিব না।”

বুদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিল, নীচের গেল, দেখিল তথায় কেহ নাই, কেবল দাসী গৃহকার্য্য করিতেছে,—গোপাল তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিস্তক্ৰ ভাবে আরও কতকদূর যাইয়া দেখিলেন যে খিড়কির দ্বার উন্মুক্ত, দ্বারের পার্শ্বে গেলেন, দেখিলেন মোক্ষদা বিজয়ের সহিত মৃদুস্বরে কথাবার্তা কহিতেছে।—গোপাল আত্মগোপন করিয়া নিভৃত হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।—তাহা এইরূপ—

মোক্ষদা । বিজয়, প্রাণেশ্বর !

বিজয় । কেন প্রিয়ে, কেন মোক্ষদা ?

মোক্ষদা । তোমার আর যাইয়া কাজ নাই, থাক, ও শুলেই ঘুমুবে ।

বিজয় । আমি আজ যাঠ, কাল আসব, আজ কাল যাত্রা বাবা বড়ংগোজ করেন, তাঁর মনে বড় সন্দেহ হয়েছে ।

মোক্ষদা । না বিজয়, তা আমি থাকিতে পারিব না—তুমি হয়ত আসিবে না,—তোমার না দেখিলে আমার প্রাণ যে কি করে, আমি যে কি হৃদয় দাতনা ভোগ করি, তাহা আমি জানি, আর সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন ।

বিরজা । মোক্ষদা প্রাণেশ্বরী, আমিও যে তোমার কত ভালবাসি আঁকি তুমি জান না, আমি তোমার নিয়ে বনচরী হ'তে পারি ।

মোক্ষদা । তা না হলে আমি তোমার দাসী কেন ?

বিরজা । মিন্দ্রে যে নিপাত গেলে আমরা সুখে রাজ্যভোগ করি ।

মোক্ষদা । বিরজের স্বপ্নে খীর মস্তক নাস্ত করিয়া কহিল
“ও যে ভাই যমের অকুটি, ও কি এখনি যাবে।”

বিরজা । দেখ মোক্ষদা, আমি কেবল তোমার মুখ চেয়ে বিবাহ কর্লাম না, তোমার ছেড়ে আমি এক দণ্ড কোথাও থাকতে পারি না । কুংকিনী তুমি শতা বল, কি কুংক জান ।

মোক্ষদা । সে বিদ্যা তোমার, তা না হলে কুলকামিনী তোমার জন্য এত পাগল ।

বিরজা । আমাদের শত মন্ত্র—তোমাদের এক কটাক্ষের দ্বারা, মোক্ষদা তুমি ঘোর মারাবিনী, আমি তোমার মোহিনী মাঝার মুগ্ধ ।

এই বলিয়া বিরজা তাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন । এই সময়ে গোপালচন্দ্রের মনে যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না—একবার মনে করিল, বাহির হইয়া তিরস্কার করি—আবার ভাবিল, তাহাতে কল কি ? আবার ভাবির হত্যা করি, আমার সুখের কটক পরিষ্কারে করি—আবার ভাবিল, হত্যা করিয়া কি নিজের আশ নষ্ট করিব । শেষ স্থির হইল যদি হত্যা করিতে হয়

তবে গোপনে । কেহ জানিবে না অথচ কার্যসিদ্ধ হইবে ।
গোপাল আবার নিস্তব্ধ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল ।

মোক্ষদা বলিল—“ভাই ঈশ্বরের এমন বিচার কেন ?—
আমার দিয়েছে ঐ মিসেটা—যদি তোমার সঙ্গে আমার
বিয়ে তত তা হলে আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর
কেউ থাকত না ।

মোক্ষদা কাদিল । বিজয় খীর বসন প্রান্ত দ্বারা তাহার
চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন “কেননা ।”

মোক্ষদা । না কেন্দে যে থাকতে পারি না ভাই : ওকে
দেখলে সে প্রাণ কেনন করে । কি ঘটনা যে হয় তা আর
কি বলব । ভাই, কেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল না ?
বিজয় । এত বিবাহই—

মোক্ষদা । তা বটে তবু—

বিজয় মনে মনে বলিল “কি পাগল ! আমার স্ত্রী হবে .
আমি একে বিবাহ করব—মরণ আব কি, সে কদিন যৌবন
সেই কদিন সোভাগি—মধু নিয়ে ভ্রমবেব সম্বন্ধ । লোকে
বলে রমণী পুরুষকে বশ করে, ছাটি কবে—সে কেবল ছদ্ম,
‘তাব পর বিফল’, তবে রমণী বটে চিরকাল মরমে মরে—
‘উড় উড়, যেমন কাজ তেমনি ফল ।’—প্রকাশে বলিল—
“তবে এখন আদি ।”

মোক্ষদা । কাল কখন আদিবে ?

বিজয় । ঠিক রাতি ষটার সময় ।

মোক্ষদা । নিশ্চয় ?

বিজয় । নিশ্চয় ।

মোক্ষদা । দেখো আমার মাথা খাবে ।

বিজয় । বালাই তোমার শত্রুর মাথা খাই, মিসের মাথা খাই ।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল “দেখ ভাই যদি পার, আমিও হার মেনেছি ।”

বিজয় মোক্ষদাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন । মোক্ষদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে স্তব্ধ করিয়া দিল ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

মোক্ষদা ।

মোক্ষদা যেখানে হঠাৎ দীর্ঘ দীর্ঘে রক্ষণশালায় গেল, এই অবকাশে গোপাল শ্রী জয় ভাব বচন করিয়া আপন শরীরে বসিয়া শ্রবণ করিল । গোপাল ক্ষণেই হঠাৎ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পাবিল না ; অর্থাৎ নরনয়ন হঠাৎ বারি সম্পাত হঠাৎ লাগিল । “আপন স্ত্রী হঠাৎ এত কুখ্য ! এই কাল ভূজঙ্গিনীর সহিত আমি বাস করি, হৃৎচরিত্রা স্ত্রী অনারোগ্যে আমি হত্যা করিতে পারি । গোপাল অনেকক্ষণ হঠাৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, বলিলেন “হত্যা করিতে পারি না, যে সকল পুরুষের চরিত্র মন্দ তাহারা কি আপন স্ত্রীকে

হত্যা করে।" আবার ভাবিলেন "না না সে সত্য কথা, স্বী
পূর্ববে অনেক প্রভেদ।"

গোপালচন্দ্র আবার নিস্তব্ধ ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন।
তখন তাঁহার বক্ষ হ্রস্ব হ্রস্ব করিতেছে, নিশ্বাস সঘন বহিতেছে।
কপাল উষ্ণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সমস্ত ভাঁটাকে
কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অর হইয়াছে
বলিয়া স্থির করিতেন।

গোপালচন্দ্রের বিদগ্ধ হৃদয়ে তখন পূর্ব স্বীকৃত সরল বৃত্তি
ভঙ্গ হইল, তিনি সেই পতিপ্রাণার অন্য আকুলভাবে
কঁাদিলেন। কিন্তু কঁাদিয়াও সুখ নাই, কত বার জন্তুভাবে
উঠিয়া মোক্ষদা রজনশালায় আছে কিনা দেখিতে লাগিলেন।
গোপাল একবার বিরজাকে ভাবিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম পতি-
প্রেমের কথা হৃদয়ে আবির্ভাব হইল, কি মনে হইল আমি
না, বুদ্ধ কঁাদিয়া ফেলিলেন, করপুটে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করিলেন। তখনি আবার মোক্ষদাকে স্মরণ হইল,
সেই বিদগ্ধ হৃদয় যেন আবার অগিয়া উঠিল, গোপালচন্দ্র
তাঁহার প্রদাহনে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এমত সময়ে নিচে হইতে মোক্ষদা মধুর স্বরে ডাকিল
"না, পিণ্ডি শব্দ হয়েছে গেলসে।"

মোক্ষদা কি রাঙ্কিয়াছে তাঁহার স্থিরতা নাই, তাঁহার
মনে এককণ কেবল বিরজাচন্দ্রের মধুর ভাব, মধুর কথা, স্নান
রূপে আগিতেছিল, সে রাঙ্কিবে কি?

গোপালচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থিরভাবে বাইরা আঁচর
করিতে বসিলেন, মুখে একটীও কথা নাই।

মোকদ্দা বলিল “একি, কথা নাই যে, রাগ হয়েছে নাকি, মুখে যে গুলপ্ দিচ্ছে।”

গোপাল । বড় অসুখ করেছে।

মোকদ্দা । তবে গিল্তে এলে কেন ?

গোপাল । আর গিল্বে কি, যে রেখেছে।

মোকদ্দা । কেন, কি হয়েছে ?

গোপাল । মাহের বোলে এত মুনু যে মুখে ধেওয়া যায় না। মাহ তাহা গুলো চুঁয়ে পুড়ে গেছে।

মোকদ্দা । ওঁরই মুখ। আর ত কারণ মুখ নয়—তা আমার বলা কেন, যে ভাল রান্ধতে পারে তাকে আনতে পার না। রোজ খোঁটা, রোজ খোঁটা, আমি যেই মেয়ে তাই এত সঠি, অন্য কেউ হলে টেরটা পেতে। কথার কথার বলা হয় “তোমার সতিন যে থাকতো!” তা বলা কেন, যাওনা,—চুলো থেকে তাকে তুলে আনগে না, নয় তো তার কাছে গিরে মুখ বদলে এস।

গোপাল । কথা ঠিক বটে।

মোকদ্দা । আর অত অধিক্যতার কাজ নাই, খেতে হয় যাও, না বেতে হয় উঠে যাও। হাত পুড়িয়ে মরতে মরতে রান্ধলুম, সে কথা চুলোয় গেল, উনি এখন দোষ ধরতে বসলেন।

গোপাল । হাত গোড়াও কেন, আমি ত এক জন বামনী রাখতে বলি।

মোকদ্দা মনে মনে বলিল “মনের মত লোক পেলে ত রাখি” একান্তে বলিল “আমি কোথা খুঁজবো, তুমি খুঁজে আনতে পার না।”

গোপাল । কালই আনুব ;

মোকদা । এন, তার আবার ভয় দেখান কি ?

গোপাল । একি ভয় দেখান কথা হল ?

মোকদা । তা নয় ত কি ?

গোপালচন্দ্র মনে মনে বলিল “এখন কথা কহিবার ভক্তি দেখ, এতক্ষণ মধুমাগা কথা বার হজিল, আমার সঙ্গে কথা কহিতে চললেই মহা বিপদ। আমার বুকে বসে দাড়ি ধুপড়াবে একি ভরানক জ্বীলোক। আমার কপোচিৎ ফল হয়েছে বটে, এ বয়েসে বিবাহ করে যেমন শাস্তি পেতে হয় তেমনি পেলাম।”

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাপ্য পারিলেন আবার কবিয়া আচমন করিলেন। ভাগ্য লম্বুরতায় (৭) বড় মরেস পান পাঠিলেন, সেটী বিজয় বাবুর স্বাস্থ্যে পদার্পণ হইয়া ছিল বলিয়া নয় কি ?

অতঃপরে উভয়ে এক শযায় শয়ন করিলেন, সেই শুষ্ক ফেন-নিভ সুকোমল শযায় সেই শুভ্রবেশী গমিত দম্ব, বুদ্ধকে শাস্তিত দেখিয়া, বিজয়চন্দ্রের সেই সুগোল গঠন পরিপাঠ্য সেই সুন্দর মধুমাগা কথা, সেই প্রাণ ভুলান সোলাগ মনে পাড়িল, মোকদা সুন্দরী বড়ই প্রাণে বাধা পাটিল, বিধাতার এই অন্যায়া বিচারে বড়ই মর্মান্বিত হইল, বলিল “আজ যদি নাক ডাকে ত দেখতে পাবে।”

গোপাল । নাক ডাকা কি করে বন্ধ করবো ।

মোকদা । তবে তুমি একলা শুইও, আমি ওঘরে শোব, সারা দিন খেটে খুটে কি না ঘুমিয়ে থাকা যায়। আর ডাক বলে

ভাক, ওপাড়া থেকে শোনা যায়। তোমার সব বাড়ী বাড়ী।

গোপাল আর কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে গোপালচন্দ্রের অন্ন তল্লা আসিবা মাত্র, মোক্ষদা শয্যার উঠিয়া বসিয়া বলিল,—“বাপ বাপ্ বাপ্, এত পড়ারিত মানুষের হয় না। একি বাদ নাকি? নাকি মুখ দিয়ে যেন বড় বচ্ছে। নি-মস্তে বুড়ো হওয়া কি মহাপাপের কাজ রে। মুখে যেন টানাপাখা খেলচে—রড়র ঘপ্ ঘড়ব্ ঘপ্, একি!—ছি ছি ছি, কি পোড়া কপালুঠ কয়েছিলাম। মুখের গছে ভূত গালায়, বলি মক্‌গ্‌গে-লুঠ, ওমা তাব উপর আবার এত, গোদের উপর বিস্‌ফো-ড়া কি সস্তয়া যায়।”

গোপাল বড়ই মগ্নবাক্য পাঠিলেন। কোন কথাই কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

মোক্ষদা। কাল থেকে ভাল করে শ্রুত ধুরো, যে গন্ধ, খু প্‌-যেন বসি আসে।

গোপাল। মুখ ধুটনে ত কি?

মোক্ষদা। তবে গন্ধ কেন?

গোপাল। কেন তা কি জানি।

মোক্ষদা। সকল গুণই আছে।

গোপাল। গুণ সকলেরই সমান।

মোক্ষদা। কেন?

গোপাল। মনে এল বললাম।

মোক্ষদা। এমন কি বলা যা মনে আসবে তাই বলবে,

আমি তেনে এসেছি আর কি । বড় বয়সে টোপস মাথার
দিয়ে পায় ধরতে গেছে কেন ?

গোপাল । অপরাধ হয়েছে ।

মোকদ্দা । অপরাধ বলে আমার অকল্যাণ কর্ছ ।

গোপাল । অকল্যাণ আবার কি ?

মোকদ্দা । তা বটেত—আমার আবার অকল্যাণ কি,
যত কিছু ওঁর, আর ওঁর বিরজার ।

গোপাল । আর কগড়ার কাজ নেই, যুমোও ।

মোকদ্দা । যুমুবে না তো আর কি কর্বে ।

মোকদ্দা আবার শয়ন করিয়া বলিল “সরো ।”

গোপাল । আর কোথার সর্ব্ব ?

মোকদ্দা । তবে আমি শোব কোথা, পুঁটুলি হয়ে শোয়া
যার বুঝি—তাঁই বলনা—যে কাছে শুতে দেবে না,—আর
কোন শালি তোমার কাছে শোবে !

এই বলিয়া মোকদ্দা অপর গৃহে যাওয়া শয়ন করিল ।
গোপাল বুঝিলেন যে ইহা কালিকে বিজয়ের সত্ত্ব মিলিত
তটবার সুবিধা । তিনি আর কিছুই বলিলেন না । একরপ
কলহ মাসের অর্ধেক দিন চইত । প্রতিবারেই কি একরপ
উদ্দেশ্য ছিল ?—হইতেও পারে, বিচিত্র কি !

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:—

সাহস ।

গোপালচন্দ্র পর দিবস বখা সময়ে আপন কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু কিছু সকাল সকাল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিতেন, অন্য বেলা ৩টার সময় আসিলেন ।

মোক্ষদা স্বামীকে এক্রপ অনিয়মিত সময়ে আসিতে দেখিয়া বলিল “এখনি বে ?”

গোপাল । সহরে যেতে হবে ।

মোক্ষদা । কেন ?

গোপাল । বিশেষ আবশ্যক আছে ।

• আবশ্যক থাক না থাক এখন গেলে মোক্ষদা বাঁচে ।

মোক্ষদা একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলিল “তবে আসবে কবে।”

গোপাল । কাল ।

মোক্ষদা । দেখ এস ।

গোপাল । আসব ।

মোক্ষদা মনে মনে বলিল “এক মাস জাচ্ছিল না কেঁর ?”
মোক্ষদা স্বামীকে জল খাবার দিল । গোপাল জলযোগ করিয়া বস্ত্রাদি পরিধানান্তে বাটী হঠাতে বহির্গত হইলেন ।

এদিকে মোক্ষদা কুল দস্তে অধর টিপিয়া কৃহ তাসিয়া কেশ রচনা করিতে বসিল । দৃপৎ সম্মুখে অনাবরিত বন্ধে

বসিয়া উত্তম করিয়া মনের সাথে পেটে পাড়িয়া ধোঁপা বাঁধিল। প্রিয় পাঠিকাকে বলা আবশ্যক যে তখন আধুনিক ফিরিঙ্গি ধোঁপার প্রচলন ছিল না। মাথা বাক্তা শেষ হইলে কণেক দর্পণে আপন বদনের প্রতিবিম্ব প্রতি স্থির দৃষ্টে চাতিয়া রহিল। বলিল “আমার মুখ্‌টী কি মন্দ, কেমন দেখাচ্ছে, সাইরি, আমরাই মন কেমন কেমন করে, তা আবার পুঙ্খবের!” নীরবে অনেক ক্ষণ নানা প্রকার বদন ভঙ্গি করিয়া আপন রূপের দৌড় দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল বহিন্ধ্রী আবার কেমন দেখায়, চুপন কালে গুষ্ঠাংরের কিক্রপ গৌন্দর্য্য হয়—এটরূপ আরও অনেক দেখিল, কিন্তু সকল গুলি লিখিতে লক্ষ্য করে।

চুপাধা শেষ হইলে মোক্ষদা দিবা করিয়া শয্যা পাড়িল, উত্তম করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিল। সুবাসিত গোলাপজল গৃহ ও শয্যার চিটাইয়া দিল। উত্তম করিয়া বেশম ও ময়দা দিয়া আপন অঙ্গ মার্জনা করিয়া অঙ্গ ধৌত করিল। মনের মত গহনা গুলি পরিল, একখানি সুন্দর বদন পরিধান করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি আতর লেপন করিয়া নানাবিধ মগলা সংযোগে পান সাজিতে বসিল।

পাঠক! এ সকল আয়োজন কেন তাহা বুঝিতে পারি-
রাহেন কি? মোক্ষদার স্বামী আজি বিশেষে গিয়াছেন, এ অব-
স্থায় তাহার এ বাগরসজ্জা কি ভাল দেখায়? কিন্তু তবে
মোক্ষদা এত কেন করিতেছে, অবশ্য কারণ আছে, সে কারণ,—
অদ্য তথায় লস্টট বিজয়কৃষ্ণের শুভাগমন হইবে।

গৃহকার্য্য ও বেশ ভূষা সমাপিত হইলে মোক্ষদা কণেক

ছাদের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র দেবকে দেখিয়া বলিল
“দেখ চাঁদ, তোমায় একলা দেখিতে ভাল লাগে না—জোড়ে !
তুইজনে, মনের মতনে—জাঁক্‌ থু, মিসের সঙ্গে নয় ।—ছাদে
শুয়ে চাঁদের পানে চেয়ে থাকতে বড় সুখ ।—সন্ধ্যাত হল”—
মোক্ষদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার দেহ যেন অবশ
হইয়া আসিল, মোক্ষদা আবার বলিল

“বিজয় অনেক রাত্রে আসিবে, তাও কি হয়, এ ঘরে
সে না থাকলে কি ভাল লাগে ? চাঁদ না দেখলে কি কুণ্ডলা
হাসে ? দাসীকে ডাকিয়া বলিল “ওলো, ও চিন্তে—চিন্তে”!

“কি মা।”

দাসী আসিল ।

মোক্ষদা । একবার বাবুদের বাড়ি যা না ।

দাসী । এখন আমি তাঁর কোথা দেখা পাব ?

মোক্ষদা । কেন বাড়ীতে ।

দাসী । তিনি বুঝি এখন বাড়ীতে আছেন ?

মোক্ষদা । অমরণ, নেইত কি ? এই যে দেখতে পাচ্ছি
যেন আমার চখের উপর রয়েছে ।

দাসী । তোমার চখে রয়েছে বলে কি আমার চখেও
থাকবে ।

মোক্ষদা । তোর চখে থাকবে কেন লা । ফের যদি ওকথা
মুখে অনুবি ত তোর চোকে গেলে দেবো ।

দাসী হাসিয়া বলিল, “ আমার চখে কি থাকতে বল্চি ।

মোক্ষদা । তু হলেই হল, সে আমার এক্‌চেটে ।”

দাসী । জন্ম জন্ম থাক্ ।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল “তোর মুখে ফুলচরন পড়ুক।”

দাসী। বেশ।

মোক্ষদা। সে কথা বাক্, এখন লক্ষ্মী মা আমার একবার যা। পুজার সময় তোর মেয়েকে এক খানা গহনা দেব।

দাসী। তোমার ত আমু বল্লে আর টান সন্ন্যাসী। এখন বল কি বলতে হবে।

মোক্ষদা। বলবি পোড়াকপালে আজ ঘরে নেই—সন্ধ্যা হলেই যেন আসে।

দাসী প্রস্থান করিল।

‘মোক্ষদা শশব্যস্তে উঠিয়া মুকুরে স্থায়ী তাহুল রঞ্জিত বদন খানি দেখিতে গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—•••—

‘একে আর।

পাঠক! গোপালচন্দ্র কি প্রকৃতই মূর্খদাবাদ গিয়াছেন? না, তাঁহার সে উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার মূখ্য উদ্দেশ্য বৈর-নির্বাসন, তাঁহার সাধনা শত্রু নিপাত।

গোপাল চন্দ্র বাটি হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার একটি বন্ধুর বাটিতে গমন করিলেন, তথায় পাশা খেলা হইতেছিল,—গোপাল চিরকাল পাশাখেলাতে পটু,—পাশক্রীড়াভক্ত।—কিন্তু

আজি তাঁহার তাহাতেও অমরাগ নাই, অনেক তাঁহাকে খেলিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি নানা প্রকার শাণীরিক অশুশ্চের তাণ করিয়া খেলিতে অস্বীকৃত হইলেন। একবার অনেক পীড়াপীড়িতে খেলিতে বসিলেন, কিন্তু হাত আর খুলে না, যদিও বা হাত খুলিল, তথাপি আড়ি মারিতে পারেন না। তাঁহার সে-পাঞ্জা ফাঁক যায় না, তাঁহার আজ পোহাবাবুর কচেরার পড়িতে লাগিল। গুটী চালিতে তের ঘরে এগার ঘর হইতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় গোপাল তথা হইতে বিদায় লইয়া বাটীর দিকে আসিলেন। বাটীর পণ্ডাতেই থিড়কির ঘর, তাহার পাখেরেই একটা কোণ। তাহারই অনতিদূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, গোপালচন্দ্র একটি শাণিত ভোম্বালিয়া হস্তে তাহারই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষটী ঠিক রাস্তার উপর।

তখন চন্দ্রদেব অন্ত গিয়াছেন, সুনীল গগনে অগণ্য নক্ষত্র বাহির হইয়াছে, গোপালচন্দ্রের চতুর্দিকে অগণ্য ঝিলি ডাকিতেছে। গোপাল সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে আপন শয়ন কক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন তাহার বাতায়ণ উন্মুক্ত, গৃহমধ্যে দীপ জলিতেছে। কক্ষের স্রবাসবলিত দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে মানষের ছায়া পড়িত হইতেছে,—বুঝিলেন যে তাহা পাণিষ্ঠা মোক্ষদার ছায়া, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বিনীত-রূপিনী কালভুজঙ্গিনীর পাপছায়া! মনে করিলেন গাণীয়াসী তাম্বুর প্রিয় সমাগমের বিলম্ব হেতু অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পরিত্রমণ করিতেছে। তাঁহার দিকে দৃষ্ট সংঘর্ষিত

হইল, চক্ষু জলিয়া উঠিল, দেহ কম্পিত হইল। সেই বুদ্ধের নিস্তেজ্জ হৃদয় যৌবনের প্রবল বলে বলীয়ান্ হইল, তিনি বজ্রগুপ্তিতে ভোজালিয়া ধারণ করিয়া ভাবিলেন “না হয় উহা—কেই শেষ করি”—আবার ভাবিলেন “না না—আগে তাহাকে গারে যেরূপ বিবেচনা হয় করা যাইবে।”

গোপাল আবার নিস্তরুণ্যাবে বসিয়া রহিলেন ।

এদিকে মোক্ষদা যে দাসী পাঠাইয়া, গোপালের বৃক্ষতলে আশ্রিত আনেক পূর্বে বিজয়কে আপন কক্ষে আনাষ্টয়াছে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। তিনি পথ চাহিয়া আছেন, আসিলেই এক আঘাতে তাহার জীবন ফীলা শেষ করিবেন। কিন্তু গোপাল চন্দ্র ঘোর প্রভাবিত হইয়াছেন ; তাহার উদ্দেশ্য বুকি সফল হইল না।

গোপাল নিভুতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে কাহার হৃদ পাদবিক্ষেপ শব্দ হইল, তিনি অস্ত্র লইয়া সতর্ক হইলেন, শব্দ রজনীর ঘোর নিস্তরুণ্যাবে বোধ হইল ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। গোপাল তাহার দক্ষিণ দিকে দেখিলেন,—কে আসিতেছে ; সেই অক্ষর রাত্রি আগন্তকের শুভ্র বসন তাহার নয়ন গোচর হইল। গোপাল বুকিল—আর কে,—তাঁহার সর্কাসে যেন তাড়িত বেগে শোণিত “সংসারিত হইল, চক্ষু ধীর ও পলক বিহীন হইল, প্রতিকেশ পুষ্প যেন আপনাপন স্থানে মণ্ডায়মান হইল। আগন্তুক নিকটবর্তী—ক্রমশঃ সম্মুখবর্তী হইল,—গোপাল লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া সেই শণিত ভোজালিয়ার আঘাত করিলেন।

লোকটী “বাপ রে” বলিয়া চিৎকার করিয়া ধূলি বিলুপ্ত

হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে অপর দুইজন ব্যক্তি
 “কি করিলে, কি করিলে, মহারাজকে হত্যা করিলে ” বলিয়া
 গোপালকে ধরিয়া ফেলিল ।

গোপাল কলেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে চিৎকার করিয়া বলিলেন “আঁা কাকে কাট্তে কাকে কাট্লাম, আমার শত্রু মরিলা না, যে আমার জীবনের সুখ নষ্ট করিতেছে, আমার স্বপ্নিও খাঁক করিতেছে, তাহার নিপাত হইল না।”

গৃহমধ্যে মোক্ষদা স্তম্ভিত হইল, বিজয় বেগে আলোক
 লইয়া বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের রঙ্গস্থলে উপ-
 স্থিত হইল। লম্বা সরস দূরে গেল, বিজয় পিতৃগণের প্রতি-
 হতয়া রোদন করিতে লাগিল। মোক্ষদা ছাতে উঠিল—
 দেখিতে

ସମ୍ପ୍ରବିନ୍ଧ ପାରିତୋଷିକ ।

বৈপরীত্য ।

উমাচরণের বাসভূমি একবারে দ্রুত হঠাৎ
 হঠাৎ, অনর্গল শোণিতস্রাব হঠাৎ—ভাটার মুচ্ছা হঠাৎ—
 যাচ্ছে, বিজয়চন্দ্র উমাচরণের এতদংশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া
 তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে
 বলিলেন।

বিজয় পিতার অবস্থা দেখিয়া ক্রমে রাগে অধীর হইলেন। গোপালকে তখনও হুইজন লোকে ধরিয়া আছে, ভোজালিয়া নিকটেই পাড়িয়া আছে। বিজয় আমি কোন কথু না কহিয়া সেই ভোজালিয়া দ্বারা গোপালের গলদেশে সজোরে আঘাত করিলেন। গোপালের মস্তক দেখ হঠাৎ প্রান্ত বিচ্ছিন্ন হইল, গলার কাছে অল্প মাত্র লাগিয়া রহিল। গোপালের মৃত দেহ ভূমিতে পড়িয়া সজোরে ছটফট করিতে লাগিল। গলদেশ হঠাৎ ফোয়ারা দিয়া রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, পিছন বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু স্থির হইল।

এই গোলযোগ হইবা মাত্রই দাসী বাটী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সে ভাবিল আমি বিজয় বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া না জানি কি হুকুমই করিয়াছি। কত দেব দেবীর নিকট কতই মানসিক করিল; সে মানসিকের এক আনা অংশ দিবারও তাহার ক্ষমতা ছিলনা।

মোক্ষদা এই সময়ে ছাত্তির উপরে ছিল, সে এই ঘটনা দেখিয়া “বিজয় কি করলে, আমার সকলনাশ করলে” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বিজয়চন্দ্র একবার ছাদের দিকে তাকাইলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। উমাচরণের সম্ভিৎসারী একজন লোক বলিলেন “চিৎকার করিবেন না, বাবু যাইতেছেন, আপনার ভয় নাই।”

মোক্ষদার মৌখিক চিৎকার থামিল।

কয়েক পরে উমাচরণের জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন

যে গোপালকে কে হত্যা করিয়াছে, জিজ্ঞাসিলেন “এ কার্য কে করিয়াছে?”

• সমভিব্যাহারী বলিল “বিজয় বাবু।”

উমা। বিজয় কোথায়?

তখন বিজয় তাঁহার নিকটেই দণ্ডায়মান, লোকটী বলিল “আপনার সম্মুখে।”

উমা। বিজয়, এ কার্য কেন করিলে? একে নিজেই মরণায় অস্থির হইতেছি, আবার তোমাং চিত্তা আসিল। নবাব জানিতে পারিলে কি তোমায় দণ্ডিত করিবেন না।

একটী লোক বলিল “মহাশয় সে বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না, একথা কেহ জানিতেও পারিবেনা। কেবল গোপালের স্ত্রী জানে, তাকে বাধা করা যাইবে।”

উমা। সে শুনিবে?

বিজয়। শুনিবে।

লোকটী পুনরপি বলিল “আমরা রটনা করিব যে কোন শত্রুপক্ষীয় লোকে গোপালকে হত্যা করিয়াছে, মহারাজকে আঘাত করিয়াছিল তবে নৈবায়ুগতে কেবল মাত্র একটী চন্দ্র ছিন্ন হইয়াছে, জীবনের কোন ভয় নাই।”

উমা। আমি কি বাঁচিব?

লোক। কেন বাঁচিবেন না।

উমা। বিজয়! এসমস্ত কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, গোপাল একদিন আমার নিকট এসমস্তে হীদ্রিত করায় আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, বোধ হয় স্মরণ আছে; কিন্তু তুমি আমার পক্ষ হাত দিয়া লিপ্ত করিয়াছিলে যে সে সমস্তই মিথ্যা। আমি

আব কোন কথা বলি নাই। পুনরায় শুনিলাম, এবং সেই জন্য সত্য মিথ্যা জানিতে আসিয়া আমার এই দশা।—জল আছে কি?

বিজয় দৌড়িয়া যাইয়া গোপালের বাটী হইতে জল আনিল। আসিবার কালে মোক্ষদা বলিল “শুনিয়া যাও।”

বিজয়। আমি এখন আসিতেছি।

উমাচরণ জল পান করিতেছেন। এমনত সময়ে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে সংবাদ গয়াছিল, বাটী হইতে লোক জন ও শিবিকা আসিল। উমাচরণকে শিবিকা করিয়া বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। সকলেই শুনিয়া যে কোন শত্রু লোক এ দাবা করিয়াছে। লোকের জনতা দেখিয়া মোক্ষদা বিনাইয়া কাদিতে আরম্ভ করিল।

— — —
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবাব্ধিনয়।

— ০ —

উমাচরণ শিবিকায় উঠিয়া বলিলেন “বিজয় যে বিব্রজা ঠিক করিয়া আইল, নতুবা আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে।”

বিজয়। তবে আপনারা যান। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া পরে যাইতেছি।

ভাঁহারা সকলে গৃহে গেলেন, কর্তৃকগুলি লোক গোপালচন্দ্রের শব সংস্কার করিতে গেল। মোক্ষদাকে স্বামীর মুখাঙ্গি করিতে আর কেহ ডাকিল না। গোপাল চন্দ্রের ল'শ চার্শন

তইলে বিজয় মোক্ষদার গৃহে প্রবেশ করিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া মোক্ষদার গগনভেদী কন্দনধ্বনি থামিল ।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এপখ্যাত্ত কি মোক্ষদাকে শাস্ত্যনা করিতে প্রতিবেশিনী কেহই আসে নাই ?—আমরা বলি না । উমাচরণ বাবু যে কি প্রকার শাস্ত স্বভাবগম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন ; সুতরাং এ রাত্রে আসিয়া একটা বিপদ ঘটাইবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া কেহই আসে নাই ।—

মোক্ষদা বিজয়ের নিকটে আসিয়া বলিল “তুমি কি করিলে, এখন আমার দশায় কি হবে ?”

বিজয় । কেন ?

মোক্ষদা । আমি কোথায় দাঁড়াইব ?

বিজয় । যেখানে দাঁড়াইয়া আছে ।

মোক্ষদা । এ পরিহাসের সময় নয় ।

বিজয় দেখিল মোক্ষদা লোক মন্দ নয় ! সুতরাং বলিলেন “যেমন ছিলে তেমনি থাকিও, আমি তোমার সমস্ত গরব পত্র দিব ।”

মোক্ষদা । আমার দাড়া অতট ততটতে এমন বেদন হয় না যে তোমার সাহায্য লইতে চাইবে ।

বিজয় । তবে কি ?

মোক্ষদা । কে আমায় দেখিবে ?

বিজয় । আমি ।

মোক্ষদা । কে আমার কাছে থাকিবে ?

বিজয় । আমি ।

মোক্ষদা । তুমি কখন কোথায় থাকিবে তাহার স্থির নাই—কিন্তু আমি যে বিরহিনী পাগলিনী, আমি যে নশ্বরে নয়নে চাই ।

বিজয় । তাহাই পাটবে ।

মোক্ষদা । কয় দিন ?

বিজয় । ষত দিন বাঁচিব ।

মোক্ষদা । ইহার পর যদি তুমি আমার দূর করিয়া দাও তবে কোথায় যাইব ?

বিজয় । তোমার ত অভাব নাই—

মোক্ষদা । আমার অর্থের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তোমার প্রেমের ত অভাব আছে ।

বিজয় । আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরদিন তোমার একান্ত অনুরক্ত থাকিব ।

মোক্ষদা । পুরুষের শপথে বিশ্বাস কি ?

বিজয় । তবে, কিসে বিশ্বাস হইবে ?

মোক্ষদা । বলিতেছি ;—তুমি বিবাহ করিবে ?

বিজয় । সে সব কথা এখন কেন ?

মোক্ষদা । এখনি আবশ্যক ।

বিজয় । তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব ।

মোক্ষদা । আমার কথা শুনিবে তাহাতে বিশ্বাস কি ?

বিজয় । কিসে বিশ্বাস হয় কর ।

মোক্ষদা । আমি বলিলে তুমি বিবাহ করিবে ?

বিজয় । করিব ।

মোক্ষদা । কাহাকে ?

বিরজা । বাহাকে বলিবে ।

মোক্ষদা । এই ভাল সমস্ত মিথ্যা, বাহার বিবাহের এত সাধ, সে যে আমি বাহাকে বলিব তাহাকে বিবাহ করিবে তাহা কি কখন বিশ্বাস হয় ?

বিরজা । কেন হইবে না মোক্ষদা ।

মোক্ষদা । তবে বলি ?

বিরজা । বল ।

মোক্ষদা । শুনিবে ?

বিরজা । শুনিব ।

মোক্ষদা । আমার মাথা ছুঁইয়া বল শুনিবে ।

বিরজা তাহাই করিলেন ।

মোক্ষদা । আমার বিবাহ কর ।

বিরজা নিস্তক হইলেন. মুখে আর কথা ফুটিল না ।

মোক্ষদা । কথা নাই যে ?

বিরজা । এ বিষয় পরে বলিব ।

মোক্ষদা । পরে কেন ?

বিরজা । বাবাকে জিজ্ঞাসা করিব না ।

মোক্ষদা । তিনি যদি অসম্মত হন ।

বিরজা । তিনি অসম্মত হইবেন না ।

মোক্ষদা । তবে কর ।

বিরজা । তাহাই করিব ?

মোক্ষদা । কাল করিবে ?

বিরজা । না হয় কিছু দিবস পরেই হইবে ।

মোক্ষদা । না বিরজা তাহা হইবে না. যদি তুমি আমার

কাল রাত্দের মধ্যে বিবাহ কর তবেই উত্তম, নতুবা আমি নবাব বাগানদারের দরবারে জানাইব যে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ। আমি অন্য কোন প্রস্তাবে সন্মত হইব না।

বিজয়। বিধবা বিবাহ কি আছে ?

মোক্ষদা। না থাকে হইবে।

বিজয়। তুমি ত বক্ষ্যা, কে আমার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে ?

মোক্ষদা। কে বলিল আমি বক্ষ্যা ? আমি তিন মাস গর্ভবতী—আমি আশ্রম এক বৎসর স্বামীর নিকট শয়ন করি নাই ; আমার পুত্র হউক, কন্যা হউক, ইহা তোমারই ঔরস জাত। তোমার সম্ভান তোমার বিষয়ের অধিকারী না হইয়া আর কে হইবে ?

বিজয় নির্দীক নিষ্পন্দ।

মোক্ষদা। বিজয় উত্তর দাও, চুপ করিলে চলিবে না, আমি তাহা শুনিব না, আমার গর্ভ না হইলে আমি এত জিদ করিতাম না। তোমার ঔরস জাত সম্ভান হইয়া আমার গর্ভের দোষে কি সে এই পর্ণকুটারের উত্তরাধিকারী হইবে ? না বিজয়, না, না,—আমি প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিব না।

বিজয়। কাল ইহার উত্তর দিব।

মোক্ষদা। উত্তম, কিন্তু মনে রাখিও যে কাল শেষ দিন, হয় কাল আগিয়া স্নানোৎসব দিবে, নতুবা পরশ্ব প্রাতে আর আমার এখানে দেখিতে পাইবে না। কুলকামিনী হইলেও

অপরিচিত বিধবী বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বিন্দুমাত্র
কুণ্ঠিত হইবে না । এখন যাও ।

বিজয় । কেন থাকিলেই বা ।

মোক্ষদা । আমার বাটীতে এ সম্বন্ধে আর থাকা হইবে না,
নূতন সম্বন্ধ চাই, হয় এ বাটী তোমার হইবে, তোমার বাটী
আমার হইবে ; আমি তোমার হইব, তুমি আমার হইবে,
নতুবা এই শেষ, আমাকে শত্রু বলিয়া জানিও ।

বিজয় অগত্যা ধীর পাদ বিক্ষেপে বিমর্ষ ভাবে গৃহাভি-
মুখে গমন করিলেন । মোক্ষদা ক্রন্দ দণ্ডে অধর টিপিয়া দক্ষিণ
হস্তের তর্জনি কম্পিত করিয়া বলিল “ এই আমার একদিন ! ”

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

হরিষে বিষাদ ।

এই ঘটনার পর দিবস সন্ধ্যার অনেক পূর্বে মোক্ষদা
উত্তম করিয়া বেশ বিন্যাস করিল । তাহুল রাগে ওঠধর
বস্ত্রিত করিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা ওঠের কোণ দুইটা বলিল
“ও চিন্তে ।”

দাসী । কেন মা ।

মোক্ষদা । কি করচি ?

দাসী । এই শল্যে থাকছি ।

মোকদা। ডের শল্‌তে আছে, আর শল্‌তে পাকাত্তে
বে না, এদিকে আর।

দাসী আসিল।

মোকদা। কাল বখন এলি, তখন রাত কত ?

দাসী। কে জানে মা, বিজয় বাবু বেকুচে এমন সময়
মামি এলাম।

মোকদা। আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে যদি আমার বে হয়
তা হলে তুই খুশী হস্ ?

দাসী। তা কি হয় !

মোকদা। হয় কি না, এখনি টের পাবি।

দাসী। সে কি গো রাঁড় ম'ল্লয়ের বিয়ে হবে ?

মোকদা। ইচ্ছে হলেই হয়।

দাসী। লোকে বলবে কি ?

মোকদা। লোকের কথায় ত আর আমি পচে যাব না।

দাসী। তা বটে, আর বড় ঘরের কথা বলেই বা কে ?
তা হলে কবে বে হবে ?

মোকদা। আজ।

দাসী। আজ্‌ কি, আর আমার সব আজ্‌গুবি কথা।

মোকদা। কেন ?

দাসী। এক বছর বৃষ্টি বিয়ে করতে আছে।

মোকদা। শান্তর বে তোর মুখস্থ—আচ্ছা চিন্তে আমার
কেমন দেখাচ্ছে ?

দাসী। বেশ !

মোকদা। বেশ কেমন বল ?

দাসী । তা আবার কি করে বল্‌ব ।

মোক্ষদা । মুনির মন টলানি গোছ না কি তাই বল

দাসী মনে মনে বলিল “আ মরণ, এই রূপে মুনির মন
টলাবেন, কি জনো যে বিজয় বাবুর মন টলেছে তা তিনিই
জানেন, আ মলো মাগী আবার বলে যে বাবু শুকে বিয়ে কর বে.
অমন তর দশ বিশটে তাঁর চাকরাণী আছে। ছুড়ি
ক্লেপ্ল নাকি,—এমন বুকের পাটা কখন দেখিনি মা।
সোরাঙ্গী মলো তা একবার গাঁ গাঁ করে চাঁচিয়ে, সব ঠাণ্ডা—
আজ আবার মাথা বেঁধে বলে বিয়ে কর্‌ব । ভাগ্‌গি পাড়ান
লোক এ বাড়িতে আসে না, তাই রক্ষে, নইলে নিশ্চয় আঁব
কাণ পাত্‌বার যো থাক্‌ত না।”

মোক্ষদা । কি লো, হাঁ করে কি দেখছিল ?

দাসী । এই তোমাকেই দেখছি ।

মোক্ষদা । আচ্ছা কেমন ফেরতা দিয়ে কাপড় পরেছি,
দেখ ।

দাসী । বেশ ।

মোক্ষদা । আ মরণ, সবই বেশ—

দাসী । তা কি বল্‌ব ?

এমন সময় বহির্কোণে কিসের শব্দ হইল । দাসী
বলিল “কে গা ?”

“দোয়ার খোল্‌ ।”

দাসী । ডোমরা কাঁরা গা ?

উত্তর । রাঙ্গবাড়ির লোক ।

মোক্ষদা অশবাস্তে বলিল “খোল্‌ খোল্‌ দোয়ার খোল্‌ ।”

মোক্ষদা মনে মনে ভাবিল যে তাহার বুকি তাহাকে লইতে আসিয়াছে ।

দাসী দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র প্রায় পঁচিশ জন লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল । হুই মনে উত্তম করিয়া মোক্ষদাকে বাঁধিল ।

মোক্ষদা রাগ ভরে বলিল “আমায় বাঁধছ কেন ?”

লোক । কাল নাগেব মলারকে খুন করেছে, রাজার হাতে কেটে দিয়েছ, আবার বাঁধছি কেন ? চল্ হারামখাদি, কাজি তোর মাথা নেবে জানিস্ নে ।

মোক্ষদার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । তাহার বত আশা সকলই ফুরাইল, বেশ বিন্যাস বুধা হইল । হরিনে বিষাদ উপস্থিত হইল !

মোক্ষদা বলিল “আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি আর কিছু চাহি না ।”

লোক । উঁনি করলেন খুন, আর আমরা দি ছেড়ে, কি সুখ রে, চল্ না, কাজি ছেড়ে দেবে এখন ।

মোক্ষদা দেখিল ঘোর বিপদ ! উপায়ান্তর নাই—ভাবিল “ইহারা আবার আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কেন এমন কুকর্ম করিয়াছিলাম, এখন উপায় ? একবার বিজয়কে দেখিতে পাইলেও যে হয়, তাহার পার ধরি, তা সেই বা কোথা ?

মোক্ষদা বলিল “কুমার বাহাহর কোথায় ?”

লোক । সে খোঁজে কাজ কি, এখন ভালর ভালর চল্, নইলে টেনে নিয়ে যাব ।

একজন লোক দাসীর প্রতি চাহিয়া বলিল “এ মাগি করে ?”

দাসী এতক্ষণ কঁপিতেছিল, বলিল “বাবা আমি বাড়ির
ঝি।”

লোক। পালা বেটা—

“হ্যাঁ যাই বাবা” বলিয়া দাসী ছুটিল, সাইবার কালে মনে
মনে বলিল “ছুঁড়ি ভাল বিয়ে করলি রে।”

একটা স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সে চিঠে দাসীকে
জিজ্ঞাসা করিল “ওখানে কি গা?”

দাসী সেকথা শুনিতে পাটিলনা—কম্পিত স্বরে তাহার
মুখ পানে চাহিয়া বলিল “কি গায় হলুদের দটা মা।”

স্ত্রীলোক। কার গো?

দাসী। ঐ ছুঁড়ি—(মুখভঙ্গি করিয়া) মুকিব—মুকিব
যাওঁনা ওদিকে, দেখগে, রাজাডাটা লোকেরা বাস্তার লোক
ধরে ধরে তেল হলুদ বিলুচ্ছে।

স্ত্রীলোক। বল কি?

দাসী। ওগো ছাঁ ছাঁ, আমার আর বকিও না, আমার
টুকরা শুকিয়ে গেছে—

স্ত্রীলোক। তুমি কাঁপছ কেন?

দাসী। দেখনা গিয়ে।

এমত সময়ে দেখিল রাজবাড়ীর লোকেরা মোক্ষদাকে বন্ধন
করিয়া লইয়া আসিতেছে।

দাসী “ও বাবা আবার ঘড়া বিলুতে যায় রে” বলিয়া
উচ্ছ্বাসে ছুটিল, স্ত্রীলোকটা কিসকত্তব্যবিশতা হইয়া তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:০:—

ভাঃখাবসান ।

বিরজার ছংগত অন্ন কষ্ট ঘুচিয়াছে, এ সংবাদ পাঠক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার পর অভাগিনীর কি হইয়াছে তাহা অবগত নহেন ।

মহারাজ অধিকাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু নবাবের লোক ভাগ্যকে ছাড়িয়া দিল না, যতরাং তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একাকী নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ।

নবাব বাহাদুরের নিকট মহারাজের বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল, এবং তিনি তাঁহাকে তৎকালে বিশেষ স্নেহ করিতেন । নবাব বাহাদুর মহারাজকে যথেষ্ট সম্মাননা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন । মহারাজও নবাবকে যথারীতি অভিবাদন পূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর অধিকার কথা উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার অসুগমিক সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন ।

নবাব বিরজার স্বামী-ভক্তি ও পাত্তিত্বতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অধিকাকে অব্যাহতি দিবার আদেশ দিলেন । তিনি মহারাজকে বলিলেন যে, এক্ষণ কঠোর নির্ভরতা ও অভ্যাচারের বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন ।

নবাব কাছিকে ডাকাইয়া ষৎপরে নাস্তি ভৎসনা করিলেন, অধিকার বিচার তিনি স্মরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহার বিচার শেষ হয়, সে পর্য্যন্ত কাছি নগর বন্দিতে থাকে এই আদেশ দিলেন ।

উমাচরণ ও তৎপুত্র বিজয়চন্দ্রের উপর খেপ্তারি পরওয়ানা পেল । এবং বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইল ।

যে দিন রাত্রে গোপালচন্দ্র কর্তৃক উমাচরণের ইস্ত কণ্ঠিত হয়, তাঁহার পর দিন এই ঘটনা ঘটয়াছিল । মোক্ষদাকে মুশিদাবানে পাঠাইবার ক্রিয়াকাল পরেই পরওয়ানা লষ্টয়া নবাবের লোক নন্দনপুরে গৌছিল ।

নবাবের লোকদিগের পৌছিবার অল্প পূর্বেই উমাচরণের মৃত্যু হইয়াছে—তাছাড়া দেখিল রাজার লোকেরা নবাবের কাছে উমাচরণের শবসৎকার করিতে যাইতেছে । নবাবের লোকেরা তাহাতে প্রতিবন্ধতা করিয়া তৎক্ষণাৎ শব মুশিদাবাদে চালান দিল, এবং বিজয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া লইয়া আসিল ।

খেপ্তার কালে বিজয় অিজ্ঞাসা করিল “ কি অপরাধে খেপ্তার করিতেছ ? ”

প্রহরী । জানি না—নবাব বাহাদুরের ভ্রম আমরা ভাবিল করিতেছি মাত্র ।

বিজয় আর কোন কথা কহিল না,—সেই রাত্রেই তিনি তাহাদের সহিত আনিতে বাধ্য হইলেন । তখন বিজয়ের মনে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না । কিন্তু মনুষ্যের সকল সময় সে ভাব মনে

থাকে না। অধিকাকে অন্যায়রূপে কড় কঠ দিয়াছে, এখন তাহা মনে হইল। এবং কথঞ্চিৎ অমুশোচনারও উদ্বেক হইল। কিন্তু এখন যদ্যপি বিজয় অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে সেই দণ্ডেই, সে সমস্ত বিশ্বস্ত হয়। আজি দৈবভূক্ষিপাকে বিজয়কৃষ্ণের নিয়তি চক্র ঘুরিয়াছে, বিজয় তাহার ফল ভোগ করিতে চলিল।

ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য যখন অপরের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা গর্হিত কার্য্য করে, তখন যদ্যপি চিন্তা করে, যে অপরে যদি তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তিনি কি দুঃখিত হন না? বস্তুত তাহা হইলে আর অত্যাচার হয় না। মনুষ্য আপনা হইতে আপনি সতক হইয়া যায়, কিন্তু মানব তাহা করে না। ক্ষমতা কালে ক্ষমতানু-যায়ী বা ততোধিক কার্য্য সম্পাদন করিতে একেবারে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, পশু ভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে;—ইহাই মনুষ্যের অধঃপতনের সূত্র; কিন্তু তাহার ফলভোগ অবশ্য-স্বাভাবী। আজি হউক, কালি হউক, সে ফলভোগ করিতেই হইবে, আজি বিজয় চন্দ্র দৈবের সেই অশক্ষণাতী নিয়মের অধীন হইয়া আপন পূর্ণকৃত অত্যাচারের ফলভোগ করিতে চলিল।

যথা সময়ে বিজয় প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া মহানগরী মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। যথা সময়ে নবাব বাহাদুর অধিকা-চরণের ন্যায্য বিচার করিলেন। এক দিন পরে অধিকার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। এক দিনে স্ত্রী অভাগিনী বিরজার মনোহঃখুচিল। এক দিনে বিজয়ী মন খুলিয়া হাসিল!

এক দিনে বালক বিজুটি ভূষণ পিতৃ স্নেহের অতুল সুখ পাইল। বলা আবশ্যক যে চিকিৎসকের বিচিত্র ক্ষমতা প্রভাবে ও অত্যাচারের অবসানে, অস্থিকাচরণের বিকৃত ভাব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি অবার পূর্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজের চেষ্টা সফল হইল, মহারাণীর আশ্রয় দানের ফল হইল, তাঁহার মনের মত কার্য হইল। সিরাজউদ্দৌলার শত পাপের কতকটা প্রশান্তি হইল, তাহার বম বস্ত্রনার হয়ত কতকটা লাঘব হইল।

পাঠক ! এই সময়ে আপনাকে বিজলী সম্বন্ধে শুটী কত কথা বলিব।—বিজলী বাল্যাবস্থাতেই পিতৃ মাতৃ হানাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় গ্রামস্থ দয়ানান লোকদিগের সাহায্যে বিবাহিতা হইয়া, প্রায় চারি বৎসর কাল, স্বামী সহবাস সুখে যাপন করেন। বিজলীর স্বামী একদিন সহসা নিক্রম্ভ হইলেন, কোথায় গেলেন, কি হইল, এ সংবাদ কেহই পাইল না। সেই পর্যন্ত বিজলী স্বামী মুখ দেখে নাই।

বিজলী বিরজার বাল্য সখী, বিজলীর এই আকস্মিক বিপদে, বিরজা মর্ষপীড়িতা হইয়া, তাঁহাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন, এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে সত্যোদয় ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। বিজলী যে বিরজাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত, সে কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। সেই পর্যন্ত বিজলী বিরজার নিকটেই আছেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—•••—

পরিশিষ্ট ।

বিরজা পিতৃবিরোগ সংবাদ শ্রবণে বড়ই বাধিতা হইল ।
 অম্বিকা ও বিজলী কত যত্নে বিরজাকে শান্তনা করিলেন ।
 অম্বিকা এখন বিরজার নিকট স্বীয় পূর্বকৃত অপরাধের জন্য
 কতই ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তাঁহার পূর্বাবস্থার কথা স্মরণ
 করিয়া কতই লজ্জিত ও দুঃখিত হন । অম্বিকা পূর্ব কথা
 পাড়িলেই বিরজা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু বিজলী
 ছাড়িত না,—সে মধ্যো মধ্যো অম্বিকাকে হাসিতে হাসিতে
 কত কথা বলিত অম্বিকা থাকিতে পারিতেন না, কাঁদিয়া
 ফেলিতেন । বিরজা বিজলীকে ভৎসনা করিলে, বিজলী
 উত্তর দিত, “আমরা কত কেঁদেছি, উনি কি একদিন কাঁদতে
 পারেন না ।”

উমাচরণের গলিত মৃত দেহের দাহ হইল । বিজয়ের তিন
 শত বেজাঘাত হকুম হইল, বেজাঘাত সহ্য করিয়া যদি বাঁচে
 তাহা হইলে কুকুর দ্বারা আহার করাইয়া তাহার ঞ্জ
 বিয়োগ করা হইবে ।

বিজয় তিন শত বেজাঘাতের নিদাক্ষণ বহুশ্রম সহ্য করিতে
 পারিল না । তাণ্ডাতেই তাহার ঞ্জ বিয়োগ হইল । ইহ
 সংসারের একটি কষ্টক যুটিল !

বিজয়ের সমস্ত সম্পত্তি নবাব বাহাদুরের খাগ হইল। তিনি বিরজার উপর বিশেষ প্রীতি হইয়া তাহার চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিলেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার আদেশ রহিল।

বিজয়চন্দ্রের বাটী ও আগ্রাব ইত্যাদি অধিকাচরণ পাইলেন।

উমাচরণের পত্নীর মাসিক বৃত্তি নিষ্কারিত হইল।

মোক্ষদা অব্যাহতি পাইল। বিরজা তাহাকে আপন আবাগে লইয়া গেল। মোক্ষদা আজি হইতে সংসার চিনিল, আপনার চরিত্রের বিষয় ভাবিয়া কতই লজ্জিত হইল।

মহারানী বিভূতিভূষণকে নিজে একটা বাটী ও কতক ভূসম্পত্তি আরগীর স্বরূপ দান করিলেন।

অম্বিকা মহারাজ ও মহারানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুপরিবারে নন্দনপুরে যাত্রা করিলেন।

সেই পর্য্যন্ত আর কেহ কখন মোক্ষদার চরিত্রের কোন দোষ দেখে নাই—মোক্ষদা বিরজাকে আপন কন্যার ন্যায়, বিভূতিকে দৌহিত্রের ন্যায়, অম্বিকাকে জামাতার ন্যায়, এবং বিজলীকে শ্রিয় সখীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল, তাহার জীবনের যেন একটি যুগান্তর হইল।

কিছু দিবস পরে বিরজার নিকটস্থ শুমীর উদ্দেশ্যে গিয়া গেল, তাঁহার রাজ দণ্ডে অন্যান্য রূপে কারাবাস হইয়াছিল, মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে তাহারও অব্যাহতি হইল। বিজলী স্বামী পাইয়া পরম পুলকিতা হইল।

বিরজার আরও সন্তানাদি হইল। অম্বিকা কখন বা

নন্দনপুরে কখন বা সপরিবারে কখনপরে থাকিয়া রাজসহবাস
 স্থখে ও বিরজার অতুল প্রেমে ডুবিয়া রহিল। এতদিনে
 বিষয়কে অন্ত কল কলিল !!!

সমাপ্ত।



